ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৩ সংখ্যা ।। ২২ ভাদ্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

জাগ্রত হিন্দু চেতনার জয়

জমি ফের বোর্ডের হাতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জম্মু উৎসবে মেতে উঠেছে। হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে। খেলছে হোলি। বাজছে ড্রাম, পুড়ছে বাজী। একে অপরকে ধরছে জড়িয়ে । হচ্ছে 'বিজয় র‍্যালি'। অমরনাথ যাত্রা চলাকালীন কাশ্মীর উপত্যকায় বালতাল-এ বনভূমির ৮০০ একর জমি সম্পূর্ণরূপে শ্রীঅমরনাথজী শ্রাইন বোর্ড-এর অধিকারে থাকবে। রাজ্যপাল এন এন ভোরা এবং জম্মুর হিন্দুদের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি হওয়ায় জম্মুর মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। শুধু তাই নয়, যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসব পরিষেবার প্রয়োজন, তার পরিকাঠামো নির্মাণ ও পরে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাও ওই চুক্তিতে মঞ্জুর করা হয়েছে। গত দু'মাস ধরে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড-কে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন জম্মুতে চলছিল, এবার তা শেষ হল। গত ৩১আগষ্ট এন এন ভোরার পরামর্শদাতা এস এস ব্রোয়েরিয়াকে পাশে বসিয়ে সমিতির আহ্বায়ক লীলাকর্ণ শর্মা ঘোষণা করেন, তাদের মূল দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। তাই জমি উদ্ধারের আন্দোলন এখন স্থগিত রাখা হল।

বিজেপি তো বটেই, কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্সও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। যদিও মুফতি মহম্মদের পিডিপি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই সিদ্ধান্তকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে বাতিল করে দিয়েছে।

মালদার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে

অনুপ্রবেশকারীরাও ভোটার লিস্টে নাম তোলাচ্ছে

সংবাদদাতা ঃ মালদা ।। মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিধানসভা ক্ষেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটছে যখন ঠিক তখনই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ওই কেন্দ্রগুলি থেকে ব্যাপক আবেদন জমা পড়েছে। মালদা জেলাতে আগে ১১টি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল। সম্প্রতি ১২টি কেন্দ্র হয়েছে এবং সংখ্যালঘু ভোটই বেশীরভাগ কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় এবার ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার জন্য প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মুসলিম অধ্যুষিত সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সব চেয়ে বেশি। সেখানে ১৬ হাজার ৪০৪টি আবেদন জমা পড়েছে।

এই বিধানসভা কেন্দ্রে বহু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী নাম তোলার জন্য আবেদন করেছে বলে বিভিন্ন মহলের সন্দেহ। জেলাশাসক চিত্তরঞ্জন দাস অবশ্য বলেছেন, সমস্ত আবেদন ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো তথ্য প্রমাণ দাখিল না করলে আবেদনকারীদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে না। কিন্তু যে বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও অঞ্চল প্রধানরা, তিনি যে দলেরই হোন না কেন, একই সম্প্রদায়ের সেখানে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে যে খুব কঠিন কাজ হবে না তা প্রশাসন জানে। এছাড়া ইংলিশ বাজার বিধানসভা কেন্দ্রেও যথেষ্ট মুসলিম রয়েছে এবং আগামীতে এই কেন্দ্রটিও মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে পড়বে বলে অনেকেই মনে করেছেন। এবার এই কেন্দ্র থেকেও ৭৭৪৩ জন নতুন ভোটার হিসাবে নাম তোলার জন্য আবেদন করেছে। যার মধ্যে অনেক মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর নাম থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

মালদা জেলায় এবার ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার জন্য প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মুসলিম অধ্যুষিত সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সব চেয়ে বেশি। সেখানে ১৬ হাজার ৪০৪টি আবেদন জমা পড়েছে।

বৈষ্ণবনগর ও পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ৭১০৫ এবং ১১ হাজার ৮৭৮টি আবেদন (নাম) জমা পড়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী থাকার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই সব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এত বেশি আবেদন জমা পড়ায় বি জে পি ও তৃণমূল কংগ্রেস উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বহু বাংলাদেশী এপারে টাকার বিনিময়ে এবং প্রাইমারী স্কুল বা আত্মীয়দের পরিচয় দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করে আবেদন করছে। যদিও নির্বাচন দপ্তরের একজন অফিসার বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই আবেদনগুলি যাচাই করা হচ্ছে। অবৈধ ভোটারদের আমরা আটকানোর ব্যবস্থা করব।

আবার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের বাসিন্দাদের এপারে আনার প্রস্তাব দিয়েছে বি এস এফ। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি আক্রমণ রুখতে কাঁটা তারের ওপারে থাকা বাসিন্দাদের এপারে এনে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে বলে বি এস এফ-এর অভিমত। এখনও মালদা জেলার সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে ১০৪১টি পরিবার রয়েছে। এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা কালিয়াচকে সব চেয়ে বেশি। তাদের অনেকের সাহায্যে ওই এলাকাগুলি দিয়েই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা অবৈধভাবে এদেশে ঢুকে পড়ছে। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এপারে ঢুকছে বলে বি এস এফ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি পুলিশ সুপার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং বি এস এফের

(এরপর ২ পাতায়)

এভাবে মূল্য দিতে হবে ভাবেনি লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকারীরা

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকে কেন্দ্র করে ওড়িশায় যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা তুষের আগুনের মতো এখনও ধিক ধিক করে জ্বলছে। ইতিমধ্যে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক জলসপটা আশ্রমে ঘুরে এসেছেন। এখানেই স্বামী লক্ষ্মণানন্দ ও তাঁর চারজন অনুগামীকে গত ২৩ আগষ্ট রাতে হত্যা করা হয়। ওড়িশা সরকার ও পুলিশ প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকে প্রথমে মাওবাদীদের কাজ বলে প্রচার করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে লক্ষ্মণানন্দকে বেশ কয়েকবার হত্যার চেষ্টা হলেও তিনি কখনও মাওবাদীদের কথা উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর অভিযোগের তীর ছিল যারা তাঁর কাজের বিরোধিতা করে থাকে সেই খৃষ্টান সমাজের একাংশের প্রতি।

ইতিমধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর কর্মী প্রবীণ কুমার দাস-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে যখন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন সে ধরা পড়ে। এছাড়া আরও দুই সন্দেহভাজন বিক্রম দিগাল ও উইলিয়াম দিগাল এবং আত্মগোপনকারী নওয়া গাঁ গুঞ্জবাড়ীর কুখ্যাত উগ্রবাদী খৃস্টান নেতা রাই দিগল-কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরা সবাই ধর্মান্তরিত খৃষ্টান। তাদের কাছে হত্যাকাণ্ডের সময় ব্যবহৃত কাপড়, কালো পোষাক, কালো মুখোশ এবং কিছু মারণাস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে এদের কাছ থেকে জানা গেছে, গত ২০ আগষ্ট খুরদা-জেলার লটনী-তে জনকল্যাণ সমিতির ঘরে ৩৮ জন পাদরিকে নিয়ে এক বৈঠক হয়। সূত্র অনুসারে ওয়ার্ল্ড ভিশন এই বৈঠকের উদ্যোক্তা। এই বৈঠকে ২৩ আগষ্ট স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে হত্যার ছক কষা হয়।

অন্যদিকে হিন্দু জাগরণ সমিতি-র রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন আই পি এস অফিসার অশোক সাহু এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, গত ৯ আগস্ট রাইকিয়া কম্যুনিটি সেন্টারে খৃস্টানদের এক গোপন বৈঠক হয়েছিল। সেখানে প্রাক্তন সাংসদ নকুল নায়েক, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কৃষ্ণপদ শেঠ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এইসব নেতারা গত জুলাই মাসে মধুবাবার উপর আক্রমণ এবং স্বামীজীকে গ্রেপ্তার করার দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওই খৃষ্টান নেতারা আগষ্ট

(এরপর ২ পাতায়)

সিঙ্গুরে ভোটের অঙ্ক নয়, বাস্তববোধ চাই

গূঢ়পুরুষ ।। সিঙ্গুরের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। কারণ, রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল নেত্রী কোনও পক্ষই সমস্যার সমাধানে সততার পরিচয় দিচ্ছেন না। যেমন, বুদ্ধবাবুরা কলকাতায় মহামিছিল করলেন তৃণমূলের পথ অবরোধের পাল্টা জবাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগত কৃষিজমি রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সিঙ্গুরে টাটার কারখানার সামনে লাগাতার ধর্ণা চলছেই। দাবি, বিতর্কিত ৪০০ একর জমি ফেরৎ দিতে হবে। এই দাবি যে বাস্তবসম্মত নয়, সেকথা তৃণমূল নেত্রীর না জানার কোনও কারণ নেই। কারণ, এই বিতর্কিত জমির পুরোটাই যে অনিচ্ছুক চাষিদের কাছ থেকে জোর করে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এমন নয়। জমির একটা অংশ হুকুম দখল করা হয়। এবং তা করা হয় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে। প্রতিবাদে অনিচ্ছুক চাষিরা আজও ক্ষতিপূরণের টাকা নেননি। সমস্যা হচ্ছে যে এইসব প্রতিবাদী চাষিদের জমি অধিগৃহীত এলাকায় এক লপ্তে নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, ছড়িয়ে থাকা জমি কীভাবে অনিচ্ছুক চাষিদের ফেরৎ দেওয়া যাবে। তাছাড়া যে ভূমিসংস্কার আইনে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই আইনেই বলা আছে অধিগৃহীত জমি ফেরৎ দিতে হলে তা প্রকাশ্যে নিলাম ডেকেই করতে হবে। রাজ্য সরকারের এই বক্তব্য পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়। তবে এমনও নয় যে এই সমস্যার বা বাধার সমাধান নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই পথে না হেঁটে রাজনীতির চোরা পথে হাঁটছে। সিঙ্গুর সমস্যার জট খোলার চেয়ে বুদ্ধবাবুরা বেশি আগ্রহী মমতার কপালে শিল্প বিরোধী তকমা লাগাতে। মমতা রাজ্যের উন্নয়ণ চান না, এই প্রচার চালিয়ে আসন্ন লোকসভার ভোটে ফায়দা তুলতে।

মমতাও রাজনীতির চোরা পথেই হাঁটছেন। তাঁরও লক্ষ্য লোকসভার আসন্ন নির্বাচন। তিনি যেভাবে বিতর্কিত ৪০০ একর জমি ফেরৎ দিতে হবে বলে দাবি জানাচ্ছেন সেভাবে যে জমি ফেরৎ দেওয়া বাস্তবে সম্ভব নয় তাঁর অজানা নেই। আর তা জানা আছে বলেই তিনি সেই ৪০০ একরের পরিবর্তে অন্য জমি দেখিয়ে সেখানে টাটাদের গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু এতে লাভ নেই। কারণ, বিতর্কিত জমির সবটাই অনিচ্ছুক চাষিদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। যে সব চাষি পরিবার ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়েছেন তাঁরা কী টাকা ফেরৎ দেবেন। অবশ্যই ফেরৎ দেবেন না। হয়তো দেওয়া সম্ভবও নয়। এই সমস্যাটি নিয়ে মমতা আজ পর্যন্ত একটি বাক্যও খরচ করেননি। তিনি ধর্না মঞ্চে বসে আছেন অনড়

(এরপর ২ পাতায়)

মমতা ব্যানার্জী

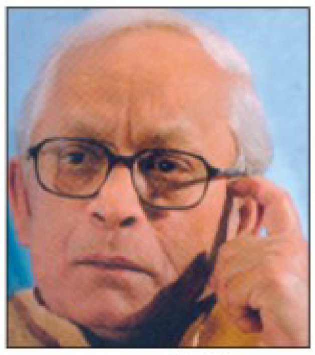

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

জয়পুর বিস্ফোরণের পাণ্ডা সিমি-র জোনাল সেক্রেটারি সাজিদ মনসুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জয়পুরের বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা মনসুরির ডান হাত শাহবাজকে রাজস্থান পুলিশ উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এখন পুলিশ ও গোয়েন্দারা স্নিফার ডগের মতোই 'মউৎ কা সদাগর' সিমি-র মূল আড্ডা রাজ্যের ঐতিহাসিক শহর কোটা-তে নিহত নিরীহ মানুষের রক্ত শুঁকে দুস্কৃতীদের সন্ধান করছে। কোটা থেকে সিমি সারা রাজ্যে তাদের ধবংসাত্মক কাজের পরিচালনা করতো। জয়পুর ও আমেদাবাদ বিস্ফোরণে সন্দিগ্ধ অপরাধী সিমি'র জোনাল সম্পাদক সাজিদ মনসুরি চার বছর ওখানে ছিল এবং ক্যাডারদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও সে করেছিল। কোটার ওয়াকফ্‌নগর থেকে ধৃত সাতজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এখবর জেনেছে রাজস্থান পুলিশ। এই ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ডাঃ ইসাক কুরেশী এবং তৌফিক কুরেশী। ইসাক ও তৌফিক মনসুরিকে সিমি ক্যাডারদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নিজের বাড়ির কাছেই জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মনসুরি তার নাম পাল্টে সেলিম নামে ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত ওই এলাকাতেই ছিল। তারপর তার নিজ রাজ্য গুজরাটে ফিরে গিয়েছিল। পাথর ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে মনসুরি চার বছর থেকে রাজস্থানে সিমির ভিত শক্তপোক্ত করার কাজ করেছিল। আবার কোটা থেকে চারজন স্থানীয় যুবক মনসুরির যোগাযোগেই গুজরাটের পাওগড়ে সিমি'র প্রশিক্ষণ শিবিরে গিয়েছিল।

তিনজন যুবক — ইমরান, আতিক এবং মেহন্দি হুসেন ওই ক্যাম্পে যায়। পরে তারা কোটাতেই দরগার কাছে গত এপ্রিল মাসে স্থানীয় যুবকদের সিমি'র দলে ভিড়িয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল। ওই শিবিরেও মূল পরিচালক ছিল ওই মনসুরি। ইসাক কুরেশী ও তার ছেলে দুজনেই মনসুরিকে ভালো মতন চেনে। গোয়েন্দা সুত্র অনুসারে তারা সিমি-র আদর্শ উদ্দেশ্য ও কাজকর্মকে সমর্থন করত এবং তারাই ট্রেনিং ক্যাম্প চালাতে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ এটা তাদের উভয়ের ব্যর্থতা বলে স্বীকার করছে। ঘটনা হল, সাজিদ জয়পুর বিস্ফোরণের কয়েক ঘন্টা আগেও কোটাতে এসেছিল। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে গুজরাট চলে যায়। এই কোটাতে উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত বসির ইলাহি সহ আধডজন শীর্ষ স্থানীয় সিমি'র নেতারা এপ্রিল মাসে জয়পুর বিস্ফোরণ-এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা করেছিল বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। মনসুরি ২০০৬-এ কোটা থেকে কেটে পড়লেও সে নিয়মিত ব্যবধানে রাজস্থানে আসত, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে সিমির ক্যাডারদের গোপন সভাতে বক্তৃতা করত।

পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে, গত ২৪ আগষ্ট লক্ষ্ণৌ থেকে ধৃত শাহবাজ হুসেন এবং মনসুরি গত ১৩ মে জয়পুরে বিস্ফোরণের দিনেও উপস্থিত ছিল। এর মধ্যে জয়পুর বার এসোসিয়েশনের উকিলরা স্থির করেছেন যে জয়পুর বিস্ফোরণে যুক্ত বলে যাদের ধরা হয়েছে তাদের হয়ে কেউ আদালতে সওয়াল করবেন না। গত ২৭ আগষ্ট তাঁরা একথা জানিয়েছেন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রধান বিচার-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দেখা গিয়েছে। ওই দিন লক্ষ্ণৌ থেকে ধৃত শাহবাজ হুসেনকে কাঠগোড়ায় তোলা হলে কোনও উকিল তার হয়ে সওয়াল করতে যাননি, রাজী হননি। পুলিশ শাহবাজকে দশদিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে।

এরকম ঘটনা রাজস্থানে মহারাণা প্রতাপের আপোসহীন সংগ্রামকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুপ্রবেশকারীরাও নাম তুলছে

(১ পাতার পর)

৬৯, ৮৭, ১২৩ এবং ১৮৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কম্যান্ডান্ট এবং বিধায়করা এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানেই বি এস এফ এই প্রস্তাব রেখেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দারা অনেকেই এপারে এসে ক্ষতিপূরণ এবং জমি কীভাবে পাবেন তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। তবে এই ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমবে বলে অনেকেই মনে করছেন। জেলাশাসক বলেছেন, একদিনে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বি এস এফের কম্যান্ডান্টদের নিয়ে এই সভাতে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেসব এলাকাতে কাঁটা তারের বেড়া নেই সেইসব এলাকাতে খুব দ্রুত বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে হবে। মালদা জেলার কালিয়াচকের মিলিক সুলতানপুর এবং বামনগোলার আগ্রা হরিশ্চন্দ্রপুরে এখনও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য এই মিলিক সুলতানপুর সীমান্তে বি ডি আরের গুলিতে এক বি এস এফের জওয়ান নিহত হয়েছিল মাত্র ছ'মাস আগে।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা ষ্ট্রীট, কলি:-৬

সিঙ্গুরে ভোটের অঙ্ক নয়, বাস্তববোধ চাই

(১ পাতার পর)

হয়ে। বিতর্কিত ৪০০ একর কৃষিজমি ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সিঙ্গুরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন সিঙ্গুরের আন্দোলন তাঁর দলকে লোকসভার ভোটে জেতাবে। সি পি এম-তৃণমূলের এই ভোটের রাজনীতিই সিঙ্গুরে সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এই দুই দলই রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা, আর্থিক উন্নয়ণ চায় না। তারা ভোটে যেন তেন প্রকারে জিততে চায়।

সি পি এমে সহ ছোট বড় সব বামপন্থী দলই নির্বাচন সর্বস্ব সুবিধাবাদি পার্টি। এবার তৃণমূল কংগ্রেসও সেই সুবিধাবাদি দলের খাতায় নাম তুললো।

রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির অনুরোধে মমতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন। মমতা জানেন যে রাজ্যপালের অনুরোধে সাড়া না দিলে জনমত তাঁর দলের বিরুদ্ধে চলে যাবে। নন্দীগ্রাম, বিদ্যুৎ ঘাটতি ইত্যাদি ব্যাপারে রাজ্যপালের ইতিবাচক ভূমিকা তাঁর ভাবমূর্তিকে যথেষ্ট উজ্জ্বল করেছে। গোপালকৃষ্ণ গান্ধি রাজ্যবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সি পি এমের আজ্ঞাবাহক দাস নন। তাই রাজ্যপালের অনুরোধকে পাত্তা না দিলে তৃণমূল নেত্রী জনসমর্থন হারাবেন সেই আশঙ্কাতেই মমতা অনুরোধের ঢোঁকি গিলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নন তা ধর্না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে। তাছাড়া তিনি দ্বিতীয় কোনও বিকল্প পথের সমাধানও দেননি। সেই ৪০০ একর জমি ফেরতের দাবিতে অনড় আছেন। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে মনে হয় অনিচ্ছুক চাষিদের সমপরিমাণ কৃষি জমি তাঁদের না নেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকায় সিঙ্গুরেই কিনে দেওয়া যেতে পারে। আর এই কাজটি সহজেই তৃণমূল পরিচালিত সেখানের পঞ্চায়েত করতে পারে। মনে রাখা দরকার যে বিতর্কিত এলাকার কৃষিজমিতে কারখানার কাজ চলার জন্য জমির উর্বরতা শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। তাই কৃষি উপযোগী বিকল্প ভাল জমি সিঙ্গুর ব্লকেই দেওয়া হলে চাষি পরিবারের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এই বিষয়ে তৃণমূল ও সি পি এম নেতৃত্ব কোনও কথা বলছেনা।

সোজা সাপটা কথায় মমতাকে যেমন তাঁর অবাস্তব জেদ ছাড়তে হবে, তেমনি বুদ্ধ বাবুদেরও অন্যায়ভাবে সিঙ্গুরে কৃষিজমি হুকুম দখলের জন্য প্রকাশ্যে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে ভবিষ্যতে টাটা বিড়লাদের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে রাজ্যের স্বার্থ আগে দেখতে হবে। নোংরা বামপন্থী রাজনৈতিক কৌশল ছাড়তে হবে। বিগত বিধানসভার নির্বাচনের আগে বুদ্ধ বাবু ইন্দোনেশিয়ার সালিম শিল্পগোষ্ঠিকে খড়গপুরের কাছে মোটর সাইকেল নির্মাণের কারখানা গড়তে জমি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বেকার যুবকরা এখানে চাকরি পাবে। কিন্তু আজও সেই জমিতে কারখানা গড়তে একটি ইঁটও পড়েনি। মোটর সাইকেল নির্মাণ তো দূরের কথা। ভোটে জেতার জন্যই সেদিন বুদ্ধ বাবু এবং তাঁর পার্টি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চিরকাল বরদাস্ত করবে না সেই সার কথাটি আলিমুদ্দিনের ম্যানেজারদের এখন বোঝা উচিৎ। তাই বলছি, সিঙ্গুর সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকার, সি পি এম, তৃণমূল সব পক্ষকেই আন্তরিক হতে হবে। ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে আলোচনার টেবিলে বসলে আখেরে কোনও লাভ নেই। প্রশ্ন, ভোট সর্বস্ব রাজনৈতিক দলের ম্যানেজাররা ভোট ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন কি?

।। সংশোধনী ।।

গত ১ সেপ্টেম্বর স্বস্তিকা-র গূঢ়পুরুষ-এর লেখায় ছিল — 'মিত্তাল শিল্পগোষ্ঠী' মেদিনীপুরের শালবনীতে বৃহৎ একটি ইস্পাত কারখানা গড়েছে। এখানে মিত্তাল-এর স্থানে 'জিন্দাল' পড়তে হবে। এই অনবধানতার জন্য দুঃখিত।

— স্বঃ সঃ

এভাবে মূল্য দিতে হবে ভাবেনি হত্যাকারীরা

(১ পাতার পর)

মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তুমুড়িবন্ধ-এর কুলমাহা গ্রামেও এক বৈঠকে উপস্থিত ছিল। যেখানে অল ইন্ডিয়া খৃস্টান কাউন্সিল-এর মুখপাত্র জন দয়াল ও ভুবনেশ্বরের আর্চবিশপ রাফেল চিনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ হল — জন দয়াল গত ১৫ দিন ওড়িশায় বিশেষ করে কন্দমাল জেলায় খৃষ্টানদের উত্তেজিত করে চলছিল। জন দয়াল সেই দেশদ্রোহী যে ভারতের খৃষ্টানরা নির্যাতিত অত্যাচারী বলে জাতিসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিযোগ করে ভারতের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার দুঃসাহস করেছিল। প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী জন দয়াল সোনিয়া গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত ও 'আদরের ছেলে' বলে পরিচিত। সে বারবার গোপন পরিকল্পনা মতো বৈঠক করে স্বামীজীর কাছে প্রথমে পাহাড়িয়া গ্রুপ-এর নামে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। পুলিশ প্রশাসন একথা জেনেও বাড়তি কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা না করায় স্বামীজীকে জীবন দিতে হল।

এই আক্রমণের পরিকল্পনা সুনিয়োজিত ছিল। এই তথ্যেই স্পষ্ট যে ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা দুইজন ব্যক্তি ভক্ত সেজে স্বামীজীর কাছে নিজদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবং আশ্রমের পরিস্থিতি তীক্ষ্ণ ভাবে নজর রাখছিল। আশ্রমে ভক্তদের যখন ভীড় কমে গেল, ভক্তেরা বিশ্রাম করছিল, তখন ওই দুজনের একজন বাইরে বেরিয়ে মোবাইলে কোনও একজনকে ফোন করে। এই মোবাইল সঙ্কেতের পর পরই হত্যাকারীরা আশ্রমের ভেতরে জোর করে প্রবেশ করে। ওই দুজন গুপ্তচর এরপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

এত স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও পুলিশ ও সরকার এটা খৃষ্টানদের কাজ বলে মানতে রাজী নয়। বরং এই নৃশংস হত্যা নকশাল-মাওবাদীরা করেছে বলে ঘটনার মোড়টা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। সংবাদমাধ্যমও পরোক্ষ ভাবে খৃষ্টান চক্রান্তের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের দায়ি করছে না। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম লক্ষ্মণানন্দ হত্যাকে গৌণ করে তার প্রতিক্রিয়াকেই অর্থাৎ জনতা যে খৃষ্টানদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে তা বড় করে দেখাচ্ছে। ঠিক যেভাবে সাবরমতী এক্সপ্রেস-এ আগুন লাগিয়ে করসেবকদের হত্যার পর হিন্দুরা যখন প্রতিক্রিয়া হিসাবে আক্রমণ করে তখন সেটাকেই বড় করে সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেছিল। করসেবকদের হত্যাকে আড়াল করে গুজরাটের দাঙ্গাকেই বড় করে তুলে ধরা হয়েছিল। এবারে দেখা যাচ্ছে, খৃষ্টান ও সেকুলারবাদী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বিকৃতভাবে ঘটনার প্রচার করতে শুরু করেছে। ইউপিএ সরকার, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দলগুলির নেতারা প্রথমে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের মৃত্যুতে 'কুমীরের কান্না' করল। তারপরে খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ হচ্ছে বলে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার বিশেষ করে নবীন পট্টনায়কের উপর আক্রমণ করে বিজেপি-বিজেডির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে। যদিও তাদের এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছে। নবীন পট্টনায়েক সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলির আনা অনাস্থা প্রস্তাব ধবনি ভোটে বাতিল হয়ে গেছে। যদিও এই ভোট-ভিখারীরা হিন্দু জাগরণ, বিশেষত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ভুলে যাচ্ছে, হিন্দু সংগঠনগুলির এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক।

এই হত্যার ফলে কন্দমাল সমেত সারা ওড়িশা ক্রোধ ফেটে পড়েছে। এটা হিন্দু জনতার পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ — স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। যারা স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে হত্যা করে পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ভেবেছিল, তাদের যে এভাবে মূল্য দিতে হবে একথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। হিন্দুদের ভাবনাকে ক্ষতবিক্ষত না করে বরং স্বামীজীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিলে হিন্দুদের ক্ষোভ প্রশমিত হবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন ঃ শ্রীসুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রবীণ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী লক্ষ্মণানন্দ মহারাজকে তাঁর অন্য চারজন অনুগামীসহ হত্যার ঘটনাকে কঠোর নিন্দা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন।

সুদর্শনজী মন্তব্য করেছেন, বার বার স্বামী লক্ষ্মণানন্দের উপর প্রাণঘাতী হামলা হলেও রাজ্য সরকার তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। এখন তাঁকে হত্যার অভিযোগে চার-পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সত্য উদঘাটিত হোক আর ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক যাতে আর কোনওদিন এরকম ঘটনা ঘটাবার সাহস যেন কেউ না করে। সরসঙ্ঘচালক প্রয়াত স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সহ পাঁচজন নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, স্বধর্ম ও মাতৃভূমি রক্ষায় ওঁরা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইউ পি এ-র নরম নীতি
দেশের পক্ষে স্লো-পয়জন

কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার কার্যত জাতিকে ঠকাইতেছে। ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী নিজেকে এবং তাঁহার অনুগামী পারিষদ বর্গকে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন। এক কথায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এখন কার্যত আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হইয়াছে। এমনকী বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ মন্ত্রিরাও কোনও জটিল বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকগুলি লইয়া ১০ নং জনপথ-এর সহিত আলোচনা করিতে সাহস করেন না।

একশো বিশ কোটির দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে খুব প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতেই পারে। দিন পনেরো আগে একটি বিখ্যাত ম্যাগাজিন-এ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আফজল গুরুর ক্ষমতা প্রার্থনার আবেদন লইয়া তাঁহার মন্ত্রক কি ভাবিতেছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, বিষয়টি তাঁহার মন্ত্রকের নয়, দিল্লী সরকারের বিবেচনাধীন। আমরা তাহাদের কাছ হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।

সত্য কথা বলিতে কী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিবার দিনক্ষণ স্থির করিবার প্রসঙ্গ উঠিলে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ প্রকাশ্যেই জানাইয়া দিয়াছিলেন, আফজল গুরু-র ফাঁসির আদেশ কার্যকর করিলে উপত্যকায় আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সোনিয়া গান্ধী হইতে মনমোহন সিং এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রত্যেকেই এই হুমকীর কাছে মাথা নত করিয়াছেন।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মন্দির সংসদ ভবনের উপর যে সন্ত্রাসবাদীর দল আক্রমণ করিয়াছিল, এই আফজল সেই আক্রমণের নাটের গুরু। এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের হাত হইতে ওইদিন সংসদ ভবনের ভিতরে থাকা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ বহু সাংসদের প্রাণ নিজেদের জীবন বলি দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন দিল্লী পুলিশের কয়েকজন। এই আক্রমণ এতটাই প্ররোচিত ছিল যে তৎকালীন কেন্দ্র সরকার সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যও প্রস্তুত হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেনারা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করিতেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুদ্ধ এড়ানো গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, যে মানুষটির কারণে ভারত-পাক যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহার ফাঁসির আদেশ কার্যকর করিবার বিষয়টি ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার স্বার্থে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার মুসলিম তোষণের জন্য যে বহুবিধ ব্যবস্থা লইয়াছে, আফজলের ফাঁসিতে তাহা বরবাদ হইবার আশংকাতেই এই ব্যবস্থা। জাতীয় নিরাপত্তা অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থে মুসলিম ক্ষোভ প্রশমনই তাহাদের লক্ষ্য। একইভাবে 'পোটা'-র বিলুপ্তি উগ্রপন্থীদের বিশেষত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি কেন্দ্র সরকারের দ্বিতীয় বিশেষ উপহার।

জাতীয় নিরাপত্তাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলার মতো দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাইতেছে। যে হারে জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়িতেছে, তাহাতে সাধরণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠিবার জোগাড়। মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমশ ঊর্দ্ধ গতি — চার হইতে বারো শতাংশে পৌঁছিয়াছে যাহা গত ষোল বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই রূঢ় বাস্তবকে আন্তর্জাতিক প্রবণতা বলিয়া অর্থমন্ত্রী ও সরকারের অন্যান্য মুখপাত্ররা এড়াইয়া যাইতেছেন। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তাহারা কয়েকটি পশ্চাৎপদ দেশের নামোল্লেখ করিতেছেন।

অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বারবারই বলিতেছেন, মুদ্রাস্ফীতি রোধে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে। ব্যাঙ্কগুলিকেও এই মর্মে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নাকি বলা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, কাজের কাজ তেমন কিছু হইতেছে না। আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধিকে আয়ত্তে আনিবার আশ্বাস দিলেও তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া প্রশ্ন থাকিয়াই যায়।

নির্বাচনমুখী জনপ্রিয় বিভিন্ন পদক্ষেপ, সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী — দুধ হইতে স্টীল, ডিজেল ও পেট্রোল-এর দাম বছরে তিনবার বাড়িয়াছে। গম আমদানিতে দুর্নীতির গন্ধপাওয়া যাইতেছে। কৃষিমন্ত্রক গমের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেও সরকার আবার গম আমদানির পরিকল্পনা করিতেছে। এইরকম ব্যর্থ আশ্বাস ও সরকারি কাজে সমন্বয়ের অভাবই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী।

ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির যে আশাব্যঞ্জক ছবি আঁকা হইতেছিল সামগ্রিকভাবে তাহা এখন নিম্নমুখী। আশা করা গিয়াছিল ২০০৮ সালে জি ডি পি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) ৯ শতাংশে পৌঁছাইবে। কিন্তু বাস্তবে এই জি ডি পি ৭.৫ শতাংশে দাঁড়াইয়া আছে।

ইউপিএ সরকারের আমলে ভারতের ভাবমূর্তি এমনই মলিন হইয়াছে যে এমনকী নেপালের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলিতেছেন, প্রথমে তিনি চীন এবং তারপরে ভারত সফরে যাইবেন। বহু চর্চিত ভারত-মার্কিন ১২৩ চুক্তির ফলে খুব বেশি হইলে ১৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে এবং এজন্য খরচও একটু বেশি হইবে। গত ১৫ আগষ্ট কাশ্মীর উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তানী পতাকা উড়াইয়াছে, ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়াছে। বস্তুত জাতীয়তাবাদী আবেগ ইউপিএ সরকারের আমলে অনেকটাই গভীরতা হারিয়েছে। সিমির-মতো দেশবিরোধী সংগঠনের প্রতি সমাজবাদী পার্টি ও তাহাদের বর্তমান বন্ধু কংগ্রেসও সহানুভূতি জানাইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে একমাত্র ভগবানই এই দেশকে রক্ষা করিতে পারেন।

মার্কসবাদী পরিবহন ব্যবস্থা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি বাস, মিনিবাস, অটো ইত্যাদির ভাড়া আবার বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য, রিয়েলিটি শো ইত্যাদি নিয়ে 'রাজনীতি সচেতন' বঙ্গবাসী যখন উদ্‌ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন ও উদ্বেল, তখনই নতুন করে পরিবহন ভাড়া বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক হারে। উদাসীন ও উদ্ভ্রান্ত বাঙালীর প্রতিবাদের ভাষা ও মানসিকতাও যেন হারিয়ে গেছে। মরা গাঙে আর কখনও বান আসবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম বাড়লে এই দেশেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে যাবে — এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে বাস, মিনিবাস, অটো ইত্যাদির ভাড়া বেড়ে যেতেই পারে। এই ব্যাপারে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে মালিকদের কতটা ক্ষতি হতে পারে এবং কতটা ভাড়া বাড়ালে তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে গিয়ে আগের লাভের হার বজায় থাকবে আর যাত্রীদের বেশি কষ্ট হবে না — এগুলো সূক্ষ্মভাবে হিসেব করতে হবে। তার জন্যে একজন বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন বসানো দরকার। তাতে থাকতে পারেন একজন কস্ট্ অ্যাকাউন্টেন্ট ও অর্থনীতিবিদ। যে কোনও সভ্য দেশে এটাই হওয়ার কথা — এটা নেতা / মন্ত্রী ও মালিকদের প্রকাশ্য বৈঠক বা গোপন সমঝোতার বিষয়ই নয়।

এই রাজ্যে ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একবারই তদন্ত কমিশন বসেছিল মহামান্য বিচারপতি বিনায়ক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও যুক্তির ভিত্তিতে কিছুটা ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন এবং সর্বনিম্ন রুটে ভাড়া দশ পয়সা (এখন চার টাকা) অপরিবর্তিত রাখার কথা বলেছিলেন। নতুন কমিশন তারপর না বসুক — অন্তত সেই রিপোর্টটাকে ভিত্তি করেই ভাড়ার পুনর্বিন্যাস করা হলে বুঝতাম যে, মার্ক্সবাদী সরকার শুধু ভনিতায় নয়, কাজেও জন দরদী। কিন্তু প্রতিবারই লক্ষ্য করি — তেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্দ্ধর্ষ পরিবহন মন্ত্রী ফিল্ডমার্শাল ম্যানেক্‌শ'র ভঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে, বাস মালিকদের অন্যায় দাবি মানবেন না বরং প্রাইভেট বাস দখল করে নেবেন — আর তার পরেই কোন্ এক গোপন ম্যাজিকে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেন। এই যাত্রা পালাটা দেখতে দেখতে আমরা এখন ক্লান্ত, বিরক্ত।

এবারেও দেখলাম — প্রথম প্রস্তের ভাড়া বাড়ানোর পর পরিবহন মন্ত্রী মুক্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে অঙ্ক আছে — মালিকদের যা ক্ষতি হত, তার চেয়ে অনেকটা বেশিই তিনি তাঁদের পাইয়ে দিয়েছেন, এরপর কোনও কথাই শোনা হবে না।

কিন্তু যথারীতি কয়েকদিন পরেই মালিকদের হুমকির জেরে নতুন ভাড়ার হার ঘোষণা করা হল। ঘটল আরেকটা মহান ডিগবাজী।

দেখা যাচ্ছে পরের পর্বে স্টেজ কমিয়ে আনা হয়েছে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে যাতে মালিকপক্ষের লাভ ক্রমে বেড়ে যায়।

তেলের দাম বাড়ায় ৪ টাকার পর ১ টাকা ভাড়া বেড়েছিল শুধু পরের স্টেজে — তারপর বেড়েছিল ৫০ পয়সা করে — এটা ছিল প্রথম দিকের প্ল্যান। তারপর কিন্তু বাস মালিকদের চাপে স্টেজ কমিয়ে আনা হয়েছে এবং ১ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। তার ফলে ৭ কি মি ভাড়া ৫ টাকা ছিল, এবার ৪ কিলো মিটারের পরেই সেটা হয়েছে ৬ টাকা। আগে ১০-১৪ কি মি দূরত্বের ভাড়া ছিল ৫.৫০ টাকা, এখন ১২ কি.মি. ছাড়লেই ৭টাকা। আগে ১৮-২২ কি.মি ভাড়া ঠিক হয়েছিল ৭.৫০ টাকায় এখন ২০ কি.মি. ছাড়ালেই ভাড়া ৮ টাকা।

আসলে, মালিকরা লক্ষ্য করেছে যে, স্বল্প দূরত্বের মাত্রাই বেশি। বাড়তি মুনাফার লোভে তাঁদের ওপরেই তাই কোপটা মারা হয়েছে। আর 'জনদরদী' সরকার মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থে তাতে সায় দিয়েছে। এটাই হয়ত নব মার্ক্সবাদ।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা অসঙ্গতির কথা বলি।

প্রথমত, স্বাধীনতার পর যখন সরকারি বাস চালু হয়েছে বা ১৯৬৭ সালে বেসরকারি বাসকেও কলকাতায় ঢোকানো হয়েছে, তখন স্টেজ ঠিক করা হয়েছে বড় বড় মোড়ের নিরিখে। যেমন, যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট, দেশপ্রিয় পার্ক, রাসবিহারী মোড় ইত্যাদি। এখন বাড়তি লাভের লোভে ভিত্তি করা হয়েছে কিলোমিটার অথচ কেউ কোনও দিন রাস্তা মেপে দেখেনি। সুতরাং আন্দাজে স্টেজ করা হয়েছে — মোড় নয়, মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ কোনও কোনও জায়গায় চিহ্নিত করা হয়েছে বাড়তি ভাড়ার ঘাঁটি।

দ্বিতীয়ত, এতে ব্যাপারটাই হয়ে উঠেছে অবৈজ্ঞানিক বস্তু। পরিবহন মন্ত্রী বলেছেন — তাঁর কাছে অঙ্ক আছে। আগে জানতাম অঙ্ক বিজ্ঞানেরই একটা শাখা, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি — এটা রাজনীতিরই বিষয়বস্তু।

ধরুন, যাত্রী যাদবপুর থেকে লেক্ স্টেডিয়ামে যাবেন — ভাড়া ৪ টাকা। তিনটে স্টপ্ আগে বাঘাযতীন থেকে তিনি উঠলেই ভাড়া দু টাকা বেড়ে যাবে — হবে ৬ টাকা। অথচ বাঘাযতীন থেকে ডাল্‌হৌসী গেলে অতগুলো স্টপের জন্য ভাড়া বাড়বে মাত্র ১ টাকা — তার অর্থ ৭ টাকা।

কোন্ মস্তিষ্ক থেকে এই ধরনের বুদ্ধি বেরিয়েছে?

তৃতীয়ত, আঘাত করা হয়েছে অন্যভাবেও। যিনি যাদবপুর থেকে ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক যাবেন, তাঁর কি হবে? আমরা ছাত্র অবস্থায় এক বাসে গিয়েছি — ভাড়া ছিল পুরনো ছয় পয়সা। এখন বাস যায় উড়াল পুল হয়ে। বাম দিকে বেঁকে না। সুতরাং ৪ টাকা দিয়ে গোলপার্ক যেতে হবে, হেঁটে গড়িয়াহাট পৌঁছে আবার বাস ধরতে হবে — খরচ হবে ৮ টাকা। সর্বহারার বিপ্লবী সরকার কার স্বার্থ দেখল? মার্ক্সকে বাদ দিয়ে মার্ক্সবাদ করলে এমনটা হয়।

চতুর্থত, তখন ভাড়া বাড়ত ২ পয়সা করে। স্টেজ ছিল ৪ পয়সা, ৬ পয়সা, ৮ পয়সার। পরে ১০ নয়া পয়সা দিয়ে স্টেজ প্রতি ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। বিধান রায় ট্রামের ভাড়া ১ পয়সা বাড়াতে চেয়েছিলেন — তাতেই তখনকার বীর বিপ্লবী মার্ক্সসিষ্ট নেতারা হুঙ্কার ছেড়ে এক বিধবংসী আন্দোলন করেছিলেন — কলকাতার বহু জায়গায় আগুন জ্বলেছে। ট্রাম-লাইন তুলে ফেলা হয়েছে, পোড়ানো হয়েছে ১৮ টা ট্রাম। কয়েকদিন ধরেই চলেছিল সেই নারকীয় অরাজকতা। যাত্রীদের স্বার্থেই নাকি সেই বিপ্লব ঘটেছিল।

আর এখন কিভাবে ভাড়া বাড়ে? স্টেজ কমিয়ে আনা হয়েছে, অথচ ভাড়া বেড়েছে স্টেজ প্রতি ১ টাকা, ২ টাকা বা তিন টাকা করে। যাকে দুটো/তিনটে বাস বদলে স্বল্প দূরত্বেও যেতে হয়, তাঁর যাতায়াতে মোট বাড়ল কত?

সেবার এক জনপ্রিয় কমরেড বলেছিলেন — ভাড়া কতটা বাড়ল, সেটা বড় কথা নয়, দেখতে হবে টাকাটা কার পকেট থেকে যাচ্ছে, দেখতে হবে সাধারণ মানুষের কষ্টের দিকটাই।

নববই-উত্তীর্ণ কমরেড, এখন টাকাটা কার পকেট থেকে যাচ্ছে? আপনাদের রাজত্বে সব বাসযাত্রীই বড়লোক হয়ে গেছেন? কাদের দিকটা আপনারা দেখছেন? পার্টিটা নাকি প্রলেটারিয়েটের ভ্যান্‌গার্ড?

পঞ্চ মত, সরকার বাস মালিকদের স্বার্থ দেখছেন দুটো কারণে। এক, এতে দলীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। আর দুই, বেসরকারি মালিকরা ভাড়া বাড়াতে পারলেই সরকারও তার বাসের ভাড়া বাড়িয়ে নিতে পারে সমতা রক্ষার নাম করে। সেক্ষেত্রে সরকারেরও আয় বাড়ার কথা অন্যদের উদ্যোগের মাধ্যমে।

কিন্তু শতচ্ছিন্ন কাঁথায় সেলাইটা হবে কোথায়? সবাই জানেন যে, সরকার পরিচালিত পাঁচটা পরিবহন সংস্থার জন্য বছরে ৪০০ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়। একটা বাস নিয়ে মালিকরা মুনাফা করেন — তাহলে সরকারের এই অবস্থা কেন? কেন এই লোকসানের বহর?

হিসেবটা দেখুন — অন্ধ্রে ১৯,৫৯৯ টা সরকারি বাসের মধ্যে রাস্তায় নামে ১৯,৪০৭ টা (৯৯.৪ শতাংশ), বেঙ্গালুরুতে নামে ৪৮৪২ বাসের মধ্যে ৪৫৫৪ টা (৯৪.৪০ শতাংশ)। মহারাষ্ট্রে এই হার ৯০.১০ শতাংশ। গুজরাটে ৮৫.৫০ শতাংশ আর এই রাজ্যে? কলকাতা দিয়েই দেখা যাক — ১০৬৭ টা বাসের মধ্যে গড়ে ৬২৪টা রাস্তায় নামে। যদি সব বাস চালানো হয়, দুই শিফ্‌টে লাগে ২৯৩৪ জন ড্রাইভার, আছেন কিন্তু ২ জন বেশি। তাঁদের অধিকাংশের কাজ নেই।

আরও লক্ষ্য করুন — সি এস টি সি মাত্র ৬২৪ টি বাসের জন্য রেখেছে ৭০৭৬ জনকে — বাস প্রতি কর্মী সংখ্যা ১১.৩৪।

দুটো চার্টই পাশাপাশি রাখা হল —

দূরত্ব	ভাড়া	দূরত্ব	ভাড়া
০৪ কি. মি.	৪ টাকা	৪ কি. মি	৪ টাকা
৪-৭ কি. মি.	৫ টাকা	৪-১২ কি.মি	৬ টাকা
৭-১০ কি. মি.	৫.৫০ টাকা	১২-২০ কি.মি.	৭ টাকা
১০-১৪ কি. মি.	৬.৫০ টাকা	২০-২৪ কি.মি.	৮ টাকা
১৪-১৮ কি.মি.	৭.৫০ টাকা		
১৮-২২ কি. মি	৮.০০ টাকা		

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

বন্যার জলকে পানীয়

বৃষ্টির বা বন্যার জলকে পানের উপযোগী করার অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছেন নাগপুরের একদল গবেষক। নাগপুরের ন্যাশনাল এনভায়রণমেন্ট রিসার্চ ইন্সিটিটিউট (এন আই আর আই) সম্প্রতি যে কোনও ধরনের জলকে বিশেষ উপাদানের সাহায্যে তা পানের উপযোগী করার পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন। নেরি-জার নামে এই উপাদানের সাহায্যে ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশ জীবনুমুক্ত পানীয় জল পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের দাবি। কোনও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছাড়াই এটা সম্ভব। শুধু তাই নয়, যেকোনও মুদির দোকান থেকে এই উপাদান কিনতে পাওয়া যাবে। এই অসাধ্য সাধন করার জন্য খড়গপুর আই আই টি কর্তৃক নিনা সাক্সেনা এক্সেলেন্স টেকনোলজি পুরস্কারও অর্জন করেছে এন আই আর আই।

বিশেষজ্ঞরা গুজরাটের বন্যায় ওই উপাদানের সাহায্যে বন্যার জলকে পানীয় হিসাবে ব্যবহারও করেছেন।

সর্বনাশা হেডফোন

রক মিউজিকের যুগে বাসে ট্রামে হেডফোন কানে ঘুরে বেড়ানোর সংখ্যাটা কম নয়। কিন্তু দিন রাত হেডফোনে গান শুনলে শরীরের সব ধরনের ক্ষতির সম্ভবনা আছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, হেডফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কানের পর্দার কোনও ক্ষতি না হলেও ককলিয়া ছিদ্রের ক্ষতির সম্ভবনা থাকে অনেক বেশি। যা আমাদের শুনতে সাহায্য করে।

শুধু তাই নয়, মাথা ব্যাথা, কানে যন্ত্রণা ও ঘুমের ব্যাঘাতও হতে পারে। রক মিউজিক অতিরিক্ত শুনলে কানের টিনিটাম রোগ হওয়ার সম্ভবনা থাকে প্রবল। এই রোগের মূল লক্ষণ হল, কানে সবসময় গুণ গুণ শব্দ হয়। সাইকোজেনিক ডিস অর্ডার হাইপারটেনশন ও হৃৎযন্ত্রের গোলমালের সম্ভবনাও থাকে যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত আপামর হেডফোন প্রিয়দের কাছে দুঃসংবাদ হলেও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এর ব্যবহার যতটা সম্ভব কম করা উচিত বলেই মনে করছেন গবেষকরা।

দায়ী ইউ পি এ

মুসলিমদের জন্য কেঁদে আকুল ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধেই আপত্তিকর মন্তব্য করলেন দিল্লীর জামা মসজিদের শাহী হিমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি। গত ৩০ আগস্ট বুখারি বলেন, সরকারি মদতেই মুসলিমরা এদেশে আজ অত্যাচারিত ও শোষিত। তিনি বামফ্রন্ট সরকারকেও এদিন এক হাত নেন। বুখারির এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকেরই মতে ইউ পি এ সরকার ও বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ইমাম আরও সুবিধা পেতেই চাঞ্চ ল্যকর মন্তব্য করেছেন। বিরোধীদের মতে ইমামের এই মন্তব্য সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর।

সরকারি আধিকারিকের সামনেই বীরভূমে হিন্দু মন্দির তছনছ

সংবাদদাতা ঃ বীরভূম ।। সরকারি আধিকারিকের সামনেই তছনছ করা হল হিন্দু ধর্মস্থান। বীরভূমের রামপুরহাট থানা এলাকার আয়াস গ্রামে এই নিয়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ বেঁধে যায়। অবস্থা সামাল দিতে জেলা প্রশাসন এই গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এলাকায় টহল দিচ্ছে র‍্যাফ বাহিনী। ইতিমধ্যে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও গ্রামের হিন্দুরা রাগে ফুঁসছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হিন্দু দেবদেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ থাকলেও গ্রামবাসীরা উক্ত ধর্মস্থানে মন্দির নির্মাণ করতে চাইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোকজন বাধা দেয়। সরকারি আধিকারিকের উপস্থিতিতে মন্দিরের মূর্তি ও পিলার ভাঙচুর করে মুসলমান গ্রামবাসীরা। জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এই ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়ায় গ্রামের হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানানোয় জেলা পুলিশ নিরপরাধ হিন্দুদের গ্রেপ্তার করে। বামফ্রন্ট সরকারের মুসলিম তোষণ নীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই ঘটনা তার আর এক প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামপুরহাট থানা এলাকার আয়াস গ্রামের তিনমাথা মোড়ে অবস্থিত বহু প্রাচীন ধর্মরাজ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের আশে পাশে বাজার বসলেও মন্দিরটি খোলা হওয়ায় নোংরা আবর্জনা পড়ে। সেই কারণে গত ২৫ আগষ্ট গ্রামবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে মন্দিরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেখানেই মন্দির লাগোয়া বাসিন্দা কালাম শেখ তার দলবল নিয়ে বাধা দেয়। মুসলমান গোষ্ঠীর দাবি মন্দিরে প্রাচীর দেওয়া যাবে না, খোলা রাখতে হবে। গ্রামবাসীরা মন্দিরের পক্ষে গ্রামপঞ্চায়েত, বিডিও অফিস এবং রামপুরহাটের এস ডি ও প্রসন্ন কুমার মন্ডলের কাছে এই সমস্যা সমাধানে আবেদন জানায়। এস ডি ও স্থানীয় বি এল আর এবং বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মন্দির সংলগ্ন জমির মাপজোপ করে জানাতে। মহকুমা শাসকের নির্দেশ মোতাবেক গত ২৬ আগষ্ট বি এল আর ও, বি ডি ও, গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতে মন্দির এলাকার জমি মাপজোপে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা যে ধর্মরাজ মন্দিরের প্রাচীর নির্মাণ করছে তা দেবোত্তর সম্পত্তি। অতএব আপত্তি নেই মন্দির নির্মাণে। কিন্তু সরকারি অধিকারিকদের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কালাম শেখের দলবল সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই ধর্মরাজ মন্দিরর মূর্তি, পিলারে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এই হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর -এর সময় সরকারি আধিকারিকরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে উন্মত্ত মুসলিমদের শাস্তির নির্দেশ না দিয়ে রামপুরহাটের মহকুমা শাসক প্রসন্ন কুমার মন্ডল উল্টে মন্দির কর্তৃপক্ষকে তাদের দেবোত্তর সম্পত্তির কাগজ দেখাতে বলে মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধরাখার নির্দেশ দেন। ২৭ আগষ্ট আয়াস গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে মহকুমা শাসক একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে গ্রামে সৃষ্ট উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করেন। সর্বদলীয় বৈঠকে নানা রাজনৈতিক দল নানা মত শেষে গ্রামে একটি শান্তি মিছিল করার প্রস্তাব দেন রামপুরহাটের মহকুমা শাসক। সেই নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে শান্তি মিছিল বেরলে গ্রামবাসী শান্তি মিছিলে ব্যাপক ইট ছোঁড়ে। মিছিলে থাকা রামপুরহাটের বিধায়ক আশীষ ব্যানার্জি সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের পুলিশ গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনওমতে ঢুকিয়ে নিরাপত্তা দেয়। এর পরই রামপুরহাট থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী আয়াস গ্রামে ঢুকে ব্যাপক লাঠিচার্জ ও ধরপাকড় শুরু করে দেয়। গ্রামে র‍্যাফ টহল দিতে শুরু করে। জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। আয়াস গ্রাম বর্তমান পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে। সর্বদল বৈঠকে হাজির থাকা বিজেপির জেলা নেতা দুধকুমার মন্ডল জানান, আয়াস গ্রামের মন্দির ভাঙা ও মূর্তি ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে বিজেপি। এবং দেবোত্তর সম্পত্তির উপর মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের যে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল তা না নিয়ে জেলা প্রশাসন কিছু রাজনৈতিক দলের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের তাঁবেদারী করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অমরনাথ আন্দোলনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি— শ্রীসুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শ্রী লীলা করণ শর্মার নেতৃত্বে গঠিত শ্রী অমরনাথ শ্রাইন সংঘর্ষ সমিতি বিগত তিন মাস ধরে বালতাল এবং দোপেলে জমির জন্য যে সংগ্রাম চালিয়েছে তার সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমিতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

সরকার প্রথম থেকেই যদি তাদের নিজেদের তৈরি আইনটি সম্পর্কে দৃঢ়তা দেখানোর ক্ষমতা রাখত তাহলে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের যে কষ্ট এবং আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে সেটা হত না। কথায় বলে চিরকাল অন্ধ থাকার চাইতে দেরিতে চোখ খোলাও ভাল। জনগণের ভাবাবেগের তীব্রতা অনুভব করে সরকার যে তাদের পদক্ষেপ বদল করেছে সেজন্য তারা ধন্যবাদের পাত্র।

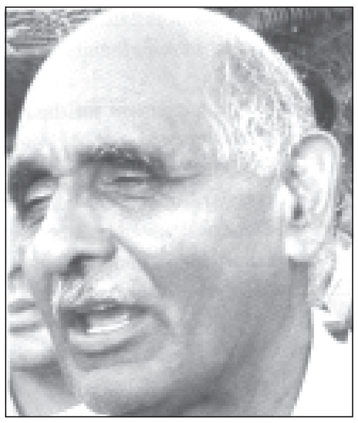

সংঘর্ষ সমিতির নেতা লীলা করণ শর্মা

আবাল-বৃদ্ধ-বানিতার এই জন আন্দোলনকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে বদনাম রটানোর চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু কেবল জম্মু ক্ষেত্রই নয়, সারা ভারতের জনগণ ধর্মমত, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধে উঠে একাত্মতার প্রদর্শন করেছেন। এটা কেবল অভিনন্দনাযোগ্যই নয়, অনুকরণযোগ্যও বটে। দেশের সমস্ত পূজনীয় ধর্মাচার্য, সাধুসন্ত মহর্ষি, মুনি ঋষিগণের আশীর্বাদও এই আন্দোলনে প্রবল শক্তি সঞ্চার করেছে। এই আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী সমস্ত শহীদগণের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে পুনরায় জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ সহ সমস্ত দেশপ্রেমী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভারত মাতা কী জয়।

মার্কসবাদী পরিবহন ব্যবস্থা

(৩ পাতার পর)

সংখ্যাটা কর্ণাটকে ৫.০৫, রাজস্থানে ৪.৯৮, উত্তরপ্রদেশে ৫.৩৭, অন্ধ্রে ৫.৯৬, তামিলনাড়ুতে ৬.২৪, এবং গুজরাটে ৬.৬। জাতীয় গড় কিন্তু ৬.৩২।

কথা আরও আছে। সম্প্রতি পরিবহন মন্ত্রী বলেছেন কর্মীদের কাজ করতে হবে, শুধু দাবি তুললেই হবে না। মনে পড়ল — এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে। তিনি আরও বলেছেন, টিকিটের টাকা ঠিক মতো জমা পড়ে না। সেটাও ক্ষতির একটা বড় কারণ। তাহলে প্রথম স্টেজে ৫০ টাকা, এবং তারপর ২০ টাকা করে ভাড়া বাড়ালেও কি এই সব সংস্থা লাভের মুখ দেখবে? মন্ত্রী আমলাদের অপদার্থতার দায় বইবেন যাত্রীরাই?

মিনিবাস ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত স্টেজ করেছে। থাক, গরীব মালিকগুলো বেঁচে বর্তে থাক। সাধারণ যাত্রীরা সামান্য ভোটার, মার্ক্সীয় গণতন্ত্রে মালিক পক্ষই তো প্রকৃত গণশক্তির প্রতীক। তাঁদের দিকটা দেখাই প্রগতিশীল সরকারের একমাত্র কাজ। এবার তাঁদের দাবি — বাস এক গেটে করতে হবে, যাত্রীদের কষ্ট হোক লাভ তো বাড়বে মালিকের।

অটোর কথা বলব না। তারা কোনও সরকারের অধীনে নয়। তাদের ইউনিয়নের নেতারাই ভাড়া ঘোষণা করে — সেটাই বেদবাক্য। ড্রাইভারের ডানদিকে যাত্রী নেওয়া নিষিদ্ধ করায় তারা ভাড়া বাড়িয়েছিল — এখন তারা অনেক সময় ডানদিকেও যাত্রী নেয়, বাম দিকে একজনের জায়গায় দু-জনকেও বসায়।

আগে বৃটিশ ট্রাম কোম্পানী দেশে লাভের টাকা পাঠাত। এখন ট্রাম কর্তৃপক্ষ লাভের লোভে বাস চালায়, বাস সংস্থা ট্রাম চালাবে, মিনির মালিকরা ট্রেন বের করবে, অটো কর্তৃপক্ষ জাহাজে লোক তুলবে।

কথা একটাই — লাভ। লাভ করতে হবে। মালিক, নেতা, নেত্রী, সরকার — সবাই উন্মাদের মতো ছুটছে লাভের আশায়। সবাইর অন্তরে এক সুর — 'এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই'।

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent L.I.C.I.
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী
চিন্তাবিদ "শিবপ্রসাদ রায়ের" অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!
অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

টাটাদের সঙ্গে চুক্তি সর্বদলীয় সভায় পেশ হোক

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

এই কলমেই লেখা হয়েছে সিপিএম ধনিক-বণিকদের হুকুমে কাছে নতজানু হয়েছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অ্যাসোচেম-এর সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য বন্‌ধের নিন্দা করতে গিয়ে সিপিএম-এর পার্টি সদস্য হওয়াকে "দুর্ভাগ্যজনক" বলেছেন। বুদ্ধ বাবুর কথার খেই ধরিয়ে বলতে পারি এই 'দুর্ভাগ্যজনক' অবসানের জন্য অবিলম্বে সিপিএম পার্টির অবলুপ্তি হওয়া দরকার। বুদ্ধ বাবু আসল চেহারাটা বণিক সংগঠনের সভায় খুলে গেছে। তিনি বণিকদের তুষ্ট করার জন্য সিপিএম-এর সদস্যপদকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন।

বুদ্ধ বাবু-নিরুপমবাবু-সুভাষ চক্রবর্তী — এঁরা তিনজনই ধনিক-বণিক-মালিকদের পক্ষের লোক। বুদ্ধ বাবু ও নিরুপমবাবুর সমন্ধে যথেষ্ট কথাবার্তা উঠছে। সুভাষবাবু সম্পর্কে এত বেশি চর্চা হয়নি। তবে সম্প্রতি বাস-ট্যাক্সি-মিনিবাস -এর ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে সুভাষবাবু তড়িঘড়ি করে তা বৃদ্ধি ঘোষণা করে দিলেন। বাসের ক্ষেত্রে ৪ টাকার পর ভাড়া এক লাফে ৬ টাকাতে চলে গেল। মাঝখানের ৫ টাকার স্টেজ তুলে দিয়ে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করলেন? বিমান বসু কি বলেন? বুদ্ধ বাবু তাঁর পূর্বসূরী এবং সুভাষ চক্রবর্তীর মতো নিজের মত প্রকাশ্যে বললেন। আজকাল কমিউনিস্ট পার্টির লোকেদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মত প্রকাশ করাটা একটা স্টাইল হয়ে গেছে।

আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য-কে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ণ অথরিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। বন্ধ চা বাগানে গড়ে উঠবে বহুতল বাড়ি। এ ঘটনার পর মাটিগাড়া তথা জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়িতে সিপিএম থেকে বহু সদস্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই সব সদস্যগণ ও বুদ্ধ বাবু বলছেন — যে পার্টির নেতা গরীবদের উৎখাত করে প্রমোটারির দরজা খুলে দিয়েছেন সেই পার্টির সদস্য থাকা দুর্ভাগ্যজনক।

এই কলমে বহু আগেই বুদ্ধ দেববাবুকে গর্বাচভ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আজ বামফ্রন্টের শরিকদল বলছে বুদ্ধ বাবু গর্বাচভ — তিনি গ্ল্যাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা প্রয়োগ করেছেন। আসলে বুদ্ধ বাবু ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, কাজেই পার্টির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রধান পুরোহিতের কাজ করছেন কি? প্রসঙ্গত অ্যাসোচেম-এর সভাপতি হলেন সজ্জন জিন্দাল। এঁদেরকে রাজ্যে লগ্নী করার জন্য বলা হয়েছে। বুদ্ধ বাবু সম্বন্ধে একটু পেছনে যাওয়া যাক। ২০০৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্টের বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল। ঐদিন বুদ্ধ বাবু দক্ষিণ কলকাতায় গাড়ি থেকে নেমে পার্টি সদস্যদের মিছিল করার জন্য তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। এ নিয়ে কলকাতা পার্টিতে তীব্র সমালোচনা উঠেছিল। বুদ্ধ বাবু ২০০৬-এর ১৮ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। আর ঐদিন রাত্রিতে মহাকরণে প্রথম ভিজিটর ছিলেন রতন টাটা! বুদ্ধ বাবুর রাজত্বে শিল্প বিরোধে ৩ কোটি শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। বুদ্ধ বাবু যতই ফাঁকা আওয়াজ করুন না কেন, কম্পিউটার শিখেও হাজার হাজার যুবক-যুবতী বেকার হয়ে বসে আছেন।

বুদ্ধ বাবুর বন্‌ধ বিরোধী উক্তির বিরুদ্ধে বাম ট্রেড ইউনিয়ন এবং বামপন্থী পার্টিগুলি তীব্র সমালোচনা করেছে। কোনও কোনও নেতা বলেছেন, বুদ্ধ বাবু সিপিএম-এর কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন?

বামফ্রন্ট সরকার-এর সমালোচনা থাকলেও এ কথা বলা যায় — বিগত তিন দশকের মধ্যে বামফ্রন্ট যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, বুদ্ধ বাবু অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নন্দীগ্রাম — সিঙ্গুর করে সেই অবস্থার অবলুপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। তাই নিচের তলার পার্টি কর্মীরা বুদ্ধ বাবুকে আর পছন্দ করেন না। জানি বুদ্ধ বাবুর বক্তব্যের সমালোচনা পার্টির পলিটব্যুরোতে ওঠবেই, এবং বলা হবে যদি কেরলের দু'জন পলিটব্যুরোর সদস্যকে পলিটব্যুরো থেকে সাসপেণ্ড করা যেতে পারে তবে বুদ্ধ বাবুকে কেন সাসপেণ্ড করা যাবে না? একথা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বলতেই পারেন। সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি সংস্থা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর গঠন করেছে। এখন থেকে এই সংস্থাই স্বাস্থ্য বিভাগের যাবতীয় নির্মাণ ক্রয়-বিক্রয় করবে। বর্তমানে এর ৫১ শতাংশ ভাগ শেয়ার সরকারের হাতে থাকলেও প্রয়োজনে এ থেকে শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি আন্দোলনে নেমেছেন।

> *"টাটাদের সঙ্গে বুদ্ধ-নিরুপমের চুক্তির মধ্যে "যদি" কোনও গোপন রহস্য না থাকে, তবে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন, সেটা মেনে নিয়ে সর্বদলীয় সভা করে চুক্তির খসড়া পেশ করলে বাজারে যে সমস্ত কথা উঠেছে তারও অবসান ঘটবে।"*

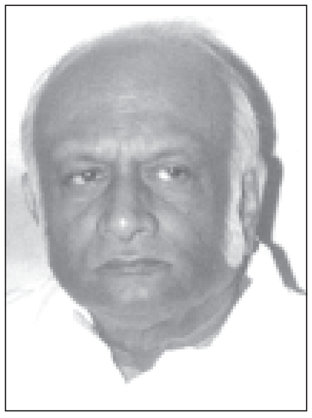

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

সুভাষ চক্রবর্তীও তাঁর ভূতল পরিবহনকে মোটামুটি বেসরকারিকরণ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে পরিবহনের জমি প্রমোটারদের কাছে বিক্রয় করে দিয়ে ঘাটতি পূরণ করেছেন। আগেই লিখেছি আবার লিখছি সিপিএম নেতৃত্ব আজ গরীব মধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষা করে না — একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাতেই ব্যস্ত। মার্কসবাদ থেকে আজ মার্কস বাদ হয়ে গেছে। আজকের সিপিএম-কে 'বামপন্থী কংগ্রেস' দলই বলা যায়। বুদ্ধ বাবু প্রণববাবুকে তাঁর বাড়ি গিয়ে কত কথা বলেছেন। কি বলেছেন? কেন বলেছেন? তা জানার উপায় নেই। কারণ কিং ক্যান ডু নো রং। রাজা কখনই অন্যায় করতে পারে না। বুদ্ধ বাবু জনগণ তথা কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন? তিনি টাটা জিন্দাল — টোডি — নেওটিয়াদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন কি?

তাইতো শোনা যাচ্ছে সিপিএম-এর নিচের তলায় একাংশ বলছেন — "বুদ্ধ-নিরুপম-সুভাষ হঠাও পার্টি বাঁচাও"।

টাটাদের সঙ্গে বুদ্ধ-নিরুপমের চুক্তির মধ্যে "যদি" কোনও গোপন রহস্য না থাকে, তবে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন, সেটা মেনে নিয়ে সর্বদলীয় সভা করে চুক্তির খসড়া পেশ করলে বাজারে যে সমস্ত কথা উঠেছে তারও অবসান ঘটবে। শোনা যাচ্ছে, "টাটারা জমির দাম ৯০ বছর ধরে দেবে। এর মধ্যে মূল ৬০০ কোটি টাকা ৬০ বছর পর দেওয়া শুরু হবে!

এখন বছরে মাত্র ১ কোটি টাকা দেবে। রাজ্য সরকার ১ শতাংশ সুদে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে? অনুসারি শিল্পের জমির একর প্রতি বছরে মাত্র ৮ হাজার টাকা। বিভিন্ন মহলে কথা উঠেছে — টাটাদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া আছে বুদ্ধ-নিরুপমের। সর্বদলীয় সভা না করা হলে লোকের মধ্যে গুজবগুলি সত্য বলে প্রতিভাত হবে। আশাকরি বুদ্ধ-নিরুপম সত্যব্রতবাবুর প্রস্তাবে এগিয়ে আসবেন।

পলিটব্যুরো বন্‌ধ নিয়ে বুদ্ধ বাবুকে সমালোচনা করেছে। পলিটব্যুরোর সভায় বুদ্ধ-নিরুপম-বিমান-এর সমালোচনা উঠেছে। এবার তা ফেটে পড়বে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়। সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সভাতেও মন্ত্রিসভার কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা হবে। বুদ্ধ বাবু জ্যোতিবাবু সুভাষ চক্রবর্তী পার্টির বিরুদ্ধে মুখ খোলার ব্যাপারে পথিকৃৎ। বুদ্ধ বাবু তো আগে নাকি একবার চোরেদের সরকার বলেছিলেন? সিপিএম-এর দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে — মাটিগাড়ায় ভাঙছে দল।

শীতল রামের ব্রত

অন্য রকম

নির্মল কর

কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের পাশেই শীতল রামের 'পাঠশালা'। রোজ সকালে শীতল রাম উচ্চগ্রামে মন্ত্রপাঠের মতো আউড়ে যায় অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে অথবা ১-এ চন্দ্র, ২-এ পক্ষ ইত্যাদি। আর ক্ষুদে পড়ুয়ারা ধুয়ো তুলে আবৃত্তি করে। সেই সঙ্গে নিজের জুতো সেলাইয়ের কাজটাও সমানে চালিয়ে যায় শীতল রাম।

শীতল রামের বাসস্থান বলতে ছোট্ট একখানা টালির ঘর। তারই দাওয়ায় গড়ে উঠেছে বিশ-পঁচিশ জন ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালাটি। ঘরের দরমার দেওয়ালে সাঁটা আছে কিছু দেবদেবী আর বাবা আম্বেদকরের একটি পোস্টার। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই তল্লাটের দিন মজুর আর রিক্সাওয়ালাদের ছেলে-মেয়ে, যাদের পয়সা খরচ করে বাবুদের স্কুলে পড়বার সঙ্গতি নেই। এদের নিয়েই শীতল রামের জগৎ এবং চিন্তা-ভাবনা। আপনজন বলতে সংসারে তার আর কেউ নেই। পেশা জুতো সেলাই। রোজগার যা হয় একজনের পেট চলে যায়। সঞ্চয় নেই, কারণ উদ্বৃত্ত অর্থের সবটাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয় করে সে। কখনও কখনও পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে বিস্কুট লজেন্সও বিতরণ করে। কোনও রকম আর্থিক সাহায্য ছাড়া শীতল রামের শিক্ষাসত্র কী করে চলে, বই খাতা পেন্সিলই বা যোগান দেয় কিভাবে ভেবে কূল পায় না পড়শিরা। শীতল রাম নিজেও জানে না, কিন্তু চলে তো যাচ্ছে। মানুষের জন্য কিছু করবার ইচ্ছে থাকলে ভগবান সহায় হন বলেই শীতল রামের বিশ্বাস। সে যে ছোট্টবেলা থেকেই বাবা আম্বেদকরের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে।

শীতল রামের তিন পুরুষ এ রাজ্যের অধিবাসী। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে স্কুলের গন্ডিটাই পেরোতে পারেনি। সে দুঃখ আজও সে ভুলতে পারে না। তার ইচ্ছে ছিল অনেক দূর পড়াশুনো করবে, বড় বড় পাস দেবে, মানুষের জন্য, বিশেষ করে দলিত গরিবদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবে। কিন্তু তা আর হল কই! পড়ার বই ফেলে ওই নবীন বয়সেই স্থানীয় একটি কারখানায় সামান্য বেতনের কাজ জুটিয়েছিল। ভেবেছিল ফের পড়াশুনো শুরু করবে, একটা ভাল কিছু করবার সবে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে শীতল, অমনি কারখানাটাই কারা যেন বন্ধ করে দিয়ে গেল। অথৈ জলে পড়ে গেল সে। ফের চাকরির সন্ধানে ক'দিন ঘোরাঘুরি করে শেষে ধুত্তোর বলে চাকরির চিন্তাটাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে জুতো সেলাইয়ের কাজে নেমে পড়ল, ভদ্র কাজের আশা ছেড়ে পিতৃপুরুষদের পেশাটাকেই আপন করে নিল। কোন ও কাজই অসম্মানের নয়, কাজের আবার বড় ছোট কী? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন দিব্যি আছে শীতল রাম। তাদের প্রকৃত শিক্ষা দানকেই সে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিয়ে-থা, সংসার ধর্ম করেনি, সন্ন্যাসীর মতনই তার জীবন-যাপন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই তার সংসার। সেই সংসার শীতল রামের উষ্ণ স্নেহে দিনে দিনে বাড়ছে।

পড়শি ছেলে-মেয়েদের হাতে খড়ি দিয়ে স্বাক্ষর করে তোলা; সত্যবাদিতা, মানব জীবনে কর্তব্যবোধ, মানবিকতা ইত্যকার নানা বিষয়ে উদাহরণ সহ পুরাণের গল্প শুনিয়ে তাদের চরিত্র গঠনে সদা সচেষ্ট শীতল রাম। তাঁর কথায় ভিতটা শক্ত করাই আসল কথা। তারপর সঙ্গতি থাকলে শীতল রামের পাঠশালা ছেড়ে অনেকে অন্যত্র চলে যায় উঁচু ক্লাসে পড়তে। উচ্চ শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা নিয়ে কেউ যখন শীতল রামের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে, সে তাদের আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে। কারণ তাদের মধ্যেই সে নিজেকে খুঁজে পায়। নিজে যা পারেনি, তার ছাত্ররা যখন তা করে দেখায়, তার চেয়ে গৌরবের আর কী হতে পারে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে বেশ কতকগুলো বছর। চোখে কম দেখে এখন শীতল রাম, শারীরিক সামর্থ্যও কমে আসছে। তবু বাকি জীবনটা গরীব দলিতদের অশিক্ষার অন্ধকারকে মুছে দিতে একনিষ্ঠ পণ করেছে শীতল রাম।

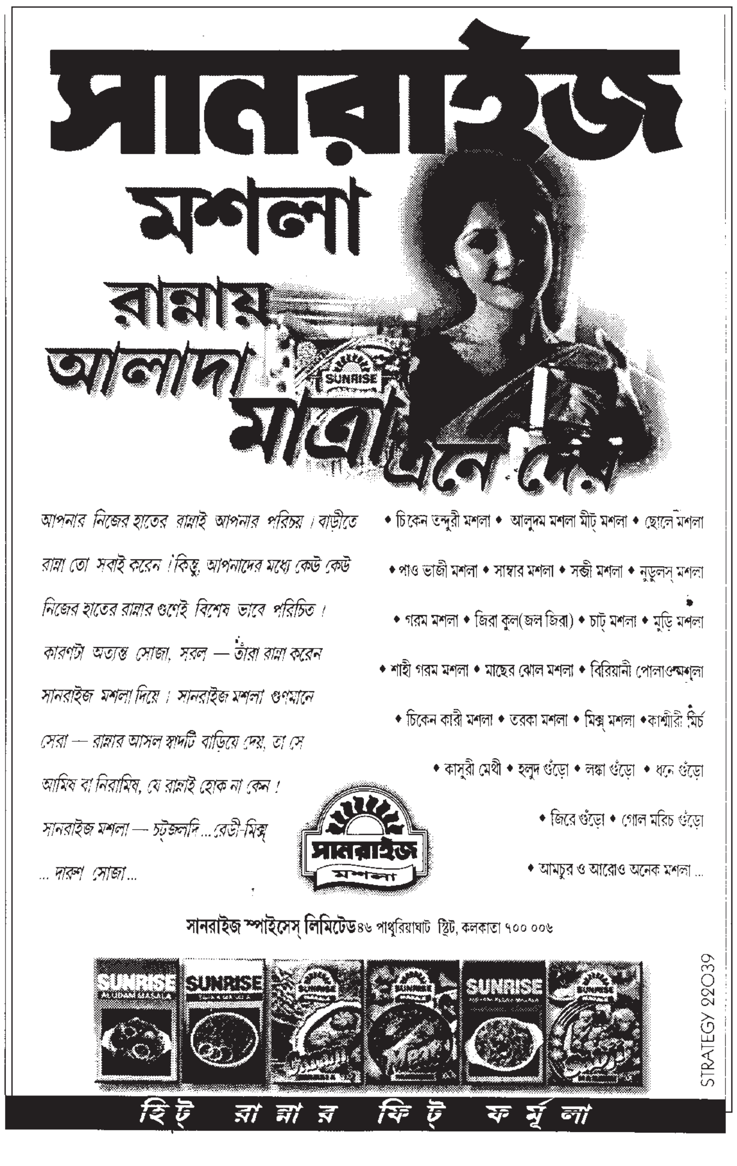

আপনার নিজের হাতের রান্নাই আপনার পরিচয়। বাড়ীতে রান্না তো সবাই করেন। কিন্তু, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের হাতের রান্নার গুণেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। কারণটা অত্যন্ত সোজা, সরল — তাঁরা রান্না করেন সানরাইজ মশলা দিয়ে। সানরাইজ মশলা গুণমানে সেরা — রান্নার আসল স্বাদটি বাড়িয়ে দেয়, তা সে আমিষ বা নিরামিষ, যে রান্নাই হোক না কেন! সানরাইজ মশলা — চট্‌জলদি... রেডী-মিক্স্ ... দারুণ সোজা...

◆ চিকেন তন্দুরী মশলা ◆ আলুদম মশলা মীট্ মশলা ◆ ছোলে মশলা
◆ পাও ভাজী মশলা ◆ সাম্বার মশলা ◆ সব্জী মশলা ◆ নুডুলস্ মশলা
◆ গরম মশলা ◆ জিরা কুল(জল জিরা) ◆ চাট্ মশলা ◆ মুড়ি মশলা
◆ শাহী গরম মশলা ◆ মাছের ঝোল মশলা ◆ বিরিয়ানী পোলাও মশলা
◆ চিকেন কারী মশলা ◆ তরকা মশলা ◆ মিক্স্ মশলা ◆ কাশ্মীরী মির্চ
◆ কাসুরী মেথী ◆ হলুদ গুঁড়ো ◆ লঙ্কা গুঁড়ো ◆ ধনে গুঁড়ো
◆ জিরে গুঁড়ো ◆ গোল মরিচ গুঁড়ো
◆ আমচুর ও আরোও অনেক মশলা ...

সানরাইজ স্পাইসেস্ লিমিটেড ৪৬ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

এ ইউ ডি এফ অসমের রাজনীতিতে নতুন ভাইরাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমের একটি বেসরকারি সংস্থা বা এন জি ও এবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে। গত ২২ আগস্ট গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই এন জি ও — অসম পাবলিক ওয়ার্কস্-এর নির্দেশক অভিজিৎ শর্মা একথা জানিয়েছেন। তাঁর মতে নির্বাচন কমিশনের গাফিলতিতেই বিশাল সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী বা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। অবিভক্ত গোয়ালপাড়া ও বরপেটা জেলাতে নিজেরাই সার্ভে করে এরকম হাজার হাজার নাগরিকের নাম সংগ্রহ করেছে এ পি ডব্লিউ। শ্রী শর্মা জানিয়েছেন, ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাপক হারে বিদেশীদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতে সব নথিপত্র পেশ করা হবে বলেও শ্রী শর্মার বক্তব্য। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তাঁর সংস্থা চায় ১৯৫১ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করেই নতুন সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি হোক। তাহলেই অসমের রাজনৈতিক শাসক নির্বাচনে বাংলাদেশীদের ভূমিকা অকার্যকর করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি কে শর্মা এক রায়ে বলেছেন, বাংলাদেশীরাই অসমের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্তা। এ পি ডব্লিউ অসম সরকারকেও একহাত নিয়েছেন।

শ্রী শর্মার বক্তব্য, কিছু রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের হয়রান করা হচ্ছে বলে সোরগোল তুলে বিদেশী বিতাড়নের বিষয়টিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। এ পি ডবলিউ সাম্প্রদায়িক মন কষাকষি নয় সমস্যার প্রকৃত সমাধান চায়। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনও প্রকৃত ভারতীয়দের হয়রান করা হচ্ছে বলে চিল-চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তারা চায় তাদের বাংলাদেশী বেরাদররা অসমে বহাল তবিয়তে থাকুক আর প্রতিনিয়ত সংখ্যাবৃদ্ধি করে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুক।

10. BOX N
UKHURI, P.S.
SAM, 78100

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অভিজিৎ শর্মা।

অসমে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গজিয়ে ওঠা বা সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দল এ ইউ ডি এফ অর্থাৎ অসম ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে অসম পাবলিক ওয়ার্কস্-এর কর্মকর্তারা অসমের রাজনীতিতে 'নতুন ভাইরাস' বলে মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ফেরৎ পাঠাতে অসম পাবলিক ওয়ার্কস্ কেন্দ্র সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে কূটনৈতিক চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভেজাল অক্সিজেনের রমরমা কারবার

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তরবঙ্গে ভেজাল অক্সিজেন-এর কারবার রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের একটি নার্সিংহোম থেকে ২টি ভেজাল অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এই ভেজাল অক্সিজেনের কারবারের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজছে পুলিশ। এই সিলিন্ডার দুটি একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেটেড অক্সিজেন উৎপাদক সংস্থার। ওই সংস্থার পক্ষে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে অক্সিজেন সরবরাহ করেছে শক্তিগড়ের শ্রীমা নামের একটি সংস্থা। আন্তর্জাতিক মেডিকেটেড অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহকারী ওই সংস্থার বিতরক অভীক ব্যানার্জী জানিয়েছেন যে, আমরা শ্রীমা নামের ওই সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করেছি চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু আমাদের ১০৭টি জাম্বো এবং ১৯১ টি বি-টাইপ সিলিণ্ডার ওই সংস্থার কাছে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, ইসলামপুরের ওই নার্সিংহোম থেকে উদ্ধার করা অক্সিজেন সহ সিলিণ্ডারও আমাদের, কিন্তু অক্সিজেন আমরা বা আমাদের অনুমোদিত কেউ সরবরাহ করেনি। সরবরাহ করেছে শ্রীমা সংস্থাটি। এখন প্রশ্ন হল, শ্রীমা অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভরতি করে কোথা থেকে? এদিকে ভেজাল অক্সিজেনের ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জানিয়েছেন যে, এর ব্যবহারে রোগীর মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া অপারেশনের ক্ষেত্রে রোগীর জ্ঞান ফিরতে বহু সময় লাগতে পারে বা বিপদ ঘটতেও পারে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে রোগীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে বা জীবনহানির আশঙ্কাও হতে পারে। অনেকে এ ঘটনায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষার অন্যতম উপাদানে ভেজালের ঘটনার ফল তো মারাত্মক হবেই। এ ব্যাপারে নার্সিংহোম-সহ সকলকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মেডিকেটেড অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতকারক সংস্থার বিতরক অভীক ব্যানার্জী জানান, ১৬ আগস্ট শ্রীমার সঙ্গে জড়িতরা আগাম জামিনের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে আবেদন জানান। শ্রীমা'র পক্ষে নাম করা আইনজীবী ছিলেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী জিতেন বসু এবং আমাদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অখিল বিশ্বাস। ভারপ্রাপ্ত জেলা বিচারক বিলাস মুখার্জী আগাম জামিন নামঞ্জুর করে দিয়েছেন। এদিকে 'শ্রীমা' সংস্থার মানসী ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার ঘনিষ্ঠ রজত ভট্টাচার্য জানান, আমাদের বিরুদ্ধে একটি বড় চক্রান্ত চলছে। আমরা ইসলামপুরের ওই নার্সিংহোম থেকে আটক করা সিলিণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত নই। ওই ঘটনার পরও সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম আমাদের কাছ থেকে অক্সিজেন নিয়ে গিয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, আমরা আদালতে গিয়েছিলাম। আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আমরা হাইকোর্টে গিয়েছি। কিন্তু আমরা হলফ করে বলছি যে, কোনও রকম ভেজাল অক্সিজেনের কারবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।

প্রকাশ থাকে যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত অক্সিজেন-এর উৎপাদন পদ্ধতি এবং সিলিণ্ডারজাত করণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেটেড অক্সিজেন উৎপাদকের ড্রাগ লাইসেন্স, উৎপাদন সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং ফার্মাকোপিয়ার নির্দেশাবলি ও পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। সেই সঙ্গে সিলিণ্ডার জাত মেডিকেটেড অক্সিজেনের গুণমান সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া প্রত্যেক সিলিণ্ডারের গায়ে ওষুধের মতো ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়ার ছাড়পত্র, ব্যাচ নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ শেষ হবার তারিখ ইত্যাদি থাকা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক মেডিকেটেড অক্সিজেন উৎপাদন ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া নিযুক্ত একজন পরিদর্শক থাকেন। তিনি এই উৎপাদিত অক্সিজেনের গুণগত মান সংক্রান্ত ছাড়পত্র ইস্যু করেন। এসব সিলিণ্ডারের ব্যবহারিক নাম যথাক্রমে জাম্বো, সি-টাইপ, বি-টাইপ, এবং এ-টাইপ। এ-টাইপ সিলিণ্ডার সাধারণত অপারেশন থিয়েটারের ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন, এত সব ছাড়পত্র নেবার পরও ভেজাল সিলিণ্ডার সরবরাহ হচ্ছে কী করে?

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন-(০৩৪৬৩) ৫৬২২২

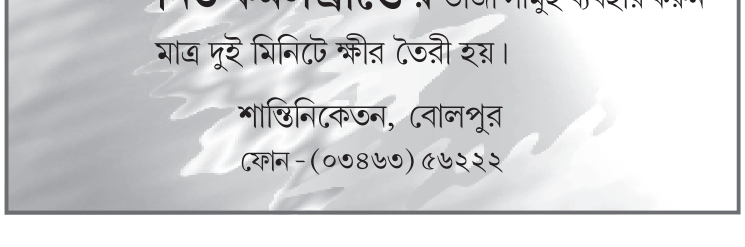

Ori Plast
P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes
Authrorised Distributor :
NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174
PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

অনুপ্রবেশ রোধে বি এস এফ-কে আরও ক্ষমতা দেওয়ার দাবি

B'DESHI
GO
BACK
ABVP
দমন নীতি
বন্ধ কৰক!
A.B.V.P

গুয়াহাটিতে বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের দাবিতে ধর্না।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রোধে বি এস এফ-এর হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানাল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অসম শাখা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সারাদেশ জুড়ে এমাস থেকেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করার জন্য এক জোরদার আন্দোলনে নেমেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সভা, সমিতি, ধর্ণা, মিছিল শুরু করে দিয়েছে।

গত ২৩ আগস্ট অসমের গুহায়াটি শহরের দীঘলপুখরিতে এক ধর্ণায় বসেছিল অখিল ভারতীয় ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। এ বি ভি পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক সুরেশ ভাট ওই ধর্ণায় যোগ দিয়েছিলেন। ভারত থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছে বিদ্যার্থী পরিষদ। একজনও অনুপ্রবেশকারী যতদিন অসমে বা সারা ভারতের কোথাও থাকবে ততদিন এই আন্দোলন থামবে না বলে বিদ্যার্থী পরিষদ জানিয়ে দিয়েছে।

সিমি-র পরবর্তী লক্ষ্য ছিল গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ধৃত সিমি নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারা গেছে 'ইণ্ডিয়ার মুজাহিদিন' ছদ্মনামের আড়ালে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিশ্রুত পর্যটনকেন্দ্র গোয়ায় আসা ইজরায়েলি নাগরিকরা। আর তার পরের টার্গেট ছিল ভারতে ব্যবসারত আমেরিকা কেন্দ্রিক বিভিন্ন কম্পিউটার সফট্ওয়ার কোম্পানী ও তাদের লোকজন। দেশজুড়ে নাশকতামূলক কাজকর্মের জন্য কর্ণাটকের হুবলিতে সিমি-র ক্যাডারদের যে ট্রেনিং হয়েছিল সেখানেই গত বছরের ডিসেম্বরে এই হামলার ব্লু-প্রিন্ট আঁকার কাজ হয়েছিল। এই নিখুঁত পরিকল্পনার রূপকার পাকিস্তানে টেররিস্ট ট্রেনিং প্রাপ্ত সিমি ক্যাডার হাফিজ হুসেন ওরফে জাইদ ওরফে তামেম রসিদ।

হাফিজ মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে জেরায় জানিয়েছে, ইজরায়েলিদের গোয়ার থাকার জায়গা ও গতিবিধির সঠিক তথ্য যোগাড় করতে আসাদুল্লা এবং নাসির নামে দুই সিমি ক্যাডার ইতিমধ্যেই রওনা হওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা হয়েছিল — গোয়ার ভীড়ে ঠাসা পানশালায়, বারে এবং ক্যাসিনোতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বোমা ব্যবহারের। তাছাড়া মোটর সাইকেলে বোমা রাখারও প্ল্যান ছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার আগেই কর্ণাটকের দাভাঙ্গেরে জেলার হোনালিতে মোটর বাইক চুরি করতে গিয়ে নাসির গত জানুয়ারি মাসেই গ্রেপ্তার হয়ে যায়।

হাফিজের বয়স ২৮ বছর। ম্যাঙ্গালোরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ার সময় ১৯৯৮ সালে সে সিমি'-তে যোগ দিয়েছিল। হাফিজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে, নাসির হুবলিতেই প্রশিক্ষণের সময়ে কোথায় কীভাবে বোমা রাখা হবে তার বিস্তারিত যোজনা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখিয়েছিল। নাসির বলেছে, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বোমাতে বেসন, লাল গুঁড়ো লঙ্কা, বল বেয়ারিং ছাড়াও ধাতব চিপস্ একটা কন্টেনারে বন্ধ করে ডিটোনেটর সেট করা হত। ওই ডিটোনেটর আবার সুইচ অথবা মোবাইল ফোনের রিংটোনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া প্রশিক্ষণে আর ডি এক্স (রিসার্চ ডেভেলাপড এক্সপ্লোসিভ) ব্যবহারের অনুপুঙ্খও হাতে কলমে শেখানো হয়েছিল।

রাজ্যে রাজ্যে
রাজ্যে রাজ্যে

হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বোমা পছন্দের অন্যতম কারণ হল ওর র-মেটিরিয়াল যোগাড় করা খুবই সহজ। কেমিস্টের দোকান এবং কাগজ কল থেকে তা যোগাড় করা যায়। পরে হুবলিতে বিস্ফোরক তৈরির আরও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার কথা ছিল। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে হাফিজ নিজেই নাসির এবং সিমি ক্যাডার আসাদুল্লার হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বোমার কথাটা জানিয়েছে। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, যত দিন যাচ্ছে, একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের লীলাক্ষেত্র বা অনায়াস বিচরণক্ষেত্র ভারত জুড়েই বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে রাজনীতিক নেতাদের হাতে পড়ে আমাদের দেশের গোয়েন্দা বিভাগ-এর নড়বড়ে কাঠামোর কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়েছে। সিমি-র প্রধান সফদর হুসেন নাগোরি জিজ্ঞাসাবাদে পরিস্কার বলেছে যে, সেই জেলে বসে জয়পুর, বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদে ঠাণ্ডা মাথায় বিস্ফোরণের যাবতীয় পরিকল্পনা করেছে। তার সঙ্গে জেলে তার দলের ক্যাডাররা নিয়মিত দেখা-সাক্ষাত করত এবং পরিকল্পনাও চূড়ান্ত হত। এই সাক্ষাৎকারের ছবি বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে কয়েকদিন ধরে দেখানো হয়েছে।

গোয়ার সমুদ্র সৈকত

সংবাদ মাধ্যম দেশের গোয়েন্দা বাহিনীকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছে। গোয়েন্দারা তৎপর হলে অবশ্যই পুলিশী হেফাজতে নিরাপদে পরিকল্পনার কথা জানা যেত এবং সাম্প্রতিক তিনটি ভয়াবহ বিস্ফোরণও এড়ানো যেত বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে মৃত্যুর সদাগর নাগোরিকে পুলিশ বিসলেরি কোম্পানীর দামী মিনারেল ওয়াটার পান করতে দিচ্ছে।

ব্যাপক আর্থিক বিকাশের সম্ভাবনা

দেবভূমির বৃক্ষ থেকে ঘি

নিজস্ব প্রতিন্ধি ।। দেবভূমি হিমালয়ের কোলে একপ্রকার গাছ থেকে উৎপাদন হতে চলেছে ঘি। শুনতে আশ্চর্য হলেও একথা সত্য। উত্তরাখণ্ডের কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে 'চ্যুর' নামে একটি প্রাচীন প্রজাতির গাছ থেকে ঘি পাওয়ার সম্ভাবনা উদ্ভাবন করেছেন তারা।

প্রাচীন কাল থেকে এদেশের ঋষি মুনিরা প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়ে পূজা করে আসছেন। কখনও দেবতাত্মা বলে কখনও বা 'রত্নাকর ধৌত পদং' বলে সমুদ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সভ্যতা যতই এগিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হয়েছে, ততই দেখা দিয়েছে পর্বত সমুদ্রের মধ্যে থেকে কখনও খনিজ দ্রব্য, ঔষধি বৃক্ষ বা মূল্যবান ধাতব সামগ্রী। সম্প্রতি হিমালয়ের বুকে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পাওয়া গেছে এমনই এক মূল্যবান বৃক্ষ। যার প্রচলিত নাম চ্যুর। পাহাড়ের কোলে বসবাসরত প্রজাতিদের ভাষাতেই ওই নাম। প্রায় দু হাজার ফিট উঁচুতে এই গাছ দেখা যেত। বিভিন্ন জনজাতিরা এই গাছের রস দুধের মতো ব্যবহারও করতো। কিন্তু এই গাছই যে একদিন বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে তা ওই জনজাতিরা কেন, বিজ্ঞানীরাও কল্পনা করেননি।

আসলে ২০০০ সালে তৎকালীন এন ডি এ সরকারের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুসারে উত্তরপ্রদেশের এই পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় উত্তরাখণ্ড রাজ্য। স্বাভাবিক ভাবে দেরাদুনকে রাজধানী করে শুরু হয় নতুন উদ্যোমে কাজকর্ম। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ভেষজ গবেষণা। সুবিশাল হিমালয়ের বুকে শত সহস্র গাছ-গাছরার মধ্যে খাদ্যগুণ ঔষধিগুণের অন্বেষণের গবেষণা চলে। বিজ্ঞানীরা দেখেন হিমালয়ের বুকে এমন অজস্র গাছ রয়েছে যার ব্যবহার স্থানীয়ভাবে পাহাড়ি প্রজাতিরা করে আসছে। আবার এমন অনেক গাছ আছে যা দিয়ে অনেক মূল্যবান ঔষধিও তৈরি করা যায়। অথচ সেগুলি সমতলের সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই রকমই একটি গাছ হল চ্যুর। স্থানীয় মানুষের এই গাছকে যেমন ব্যবহার করতো, তেমনি পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতেও গাছটিকে বহন করে নিয়ে গেছে। আলমোড়া নৈনিতালেও এর ব্যবহার দেখা গেছে। পাহাড়ি মানুষরা এর সাদা রস থেকে বনস্পতি ঘি বের করে ব্যবহারও করতো। বিক্ষিপ্ত ভাবে উৎপাদানের পরিমাণটা ছিল প্রায় এক টন বা কিছু বেশী। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে পরিকল্পিত ভাবে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর ব্যবহার করলে -এর উৎপাদন বছরে বার হাজার কুইন্টালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এমনকী পরিবর্তীকালে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও হতে পারে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী এর বিজ্ঞানসম্মত নাম 'ডিপ্লোনেমা ব্যুটেরশিয়া', বা 'এসেন্ড্রা ব্যুটেরেশিয়া'। এখন ষাট হাজারেও বেশি এই গাছ হিমালয়ের বুকে রয়েছে এবং চল্লিশ হাজারেরও বেশি গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ভাবে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এখানকার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান ড্ঃ বি পি ডিমরীর মতে এই গাছের সাদা রস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং মিষ্টি হওয়ায় পাহাড়ি জনজাতিরা প্রচুর পরিমাণে খেতো। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় অবশ্য এই গাছ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও ফুলাবার, গোফল ইত্যাদি নাম ছিল ইন্ডিয়ান বাটার ট্রি নামেও সম্প্রতি পরিচিতিলাভ করেছে। নেপাল, ভূটান সিকিম সীমান্তেও নাকি এই ফল ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রির রেওয়াজ রয়েছে। রাজ্যের কৃষি মন্ত্রকের মন্তব্য অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডের আর্থিক স্থিতি বদলে দিতএই গাছ খুবই সাহায্য করবে।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
Turmeric Powder
Chilli Powder
Kashmiri MIRCH
Pepper
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

ধর্মান্তরকরণ আত

শ

ধর্মান্তরকরণ ব্যাপারটাই হচ্ছে স্রেফ ধাপ্পাবাজি। এ হচ্ছে
সর্বত্র। কোটি টাকার মুনাফা জড়িয়ে আছে এই চাতুর্য
মানবাধিকার সংগঠন — যাদের সাংগঠনিক কাজকর্মে
কাজ হচ্ছে সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করা, অর্থাৎ এ দেশে স
ওইসব মানবাধিকার সংগঠনগ

শিলঙে সেই ঘটনাটির কথা বলছি। বাসে চেপে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম। পাহাড়ী শহর, জনসংখ্যা তেমন বেশী কিছু নয়। বাসের ভেতর তাই তেমন ঠাসাঠাসি ভীড় নেই। বাস একটা স্টপেজে এসে থামল। কিছু যাত্রী নামলেন। আর সেখান থেকে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে ওঠে এলেন একজন মাঝ বয়সী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। তিনি ইংরেজী এবং মাঝেমধ্যে হিন্দীতে খৃষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করছিলেন। কেন খৃষ্টান ধর্ম এই পৃথিবীর সর্বোত্তম ধর্ম — সে কথাই তিনি বাসের অন্যান্য যাত্রীদের বুঝাতে চাইছিলেন। ভদ্রলোকের উচ্চারণ শুনে বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের লোক। শিলঙে এসব দৃশ্য নতুন কিছু নয় বলে দেখলাম, যাত্রীদের কেউ কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

> **“মিশনারীরা যখন এসেছিল তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল; আর আফ্রিকানদের ছিল জমি। তারা আমাদের শিখিয়েছিল কীভাবে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে হয়। আমরা চোখ বুজে প্রার্থনা করলাম। যখন চোখ মেললাম তখন দেখি মিশনারীরা আমাদের জমির মালিক। আমাদের হাতে শুধু বাইবেল!”**

সেই ধর্মপ্রচারক কিন্তু তবু সমানে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, “হিন্দুরা অসংখ্য দেবদেবীর পুজো করে; গোটা ব্যাপারটাই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এর ফলে প্রগতি সম্ভব নয়।” আমার পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি ইংরেজীতেই সেই ধর্ম প্রচারককে বললেন, “জেন্টলম্যান, তুমি খৃষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করছো তো কর। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে গিয়ে তুমি খামোখা হিন্দু বা অন্য ধর্মের সমালোচনা করছো কেন! বাইবেল আমিও তোমার থেকে কম পড়িনি। তুমি আমায় বল, বাইবেলের কোথায় হিন্দু ধর্ম বা দেবদেবীর এমন সমালোচনা করা হয়েছে।” সেই ধর্মপ্রচারক প্রথমটায় তর্ক জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে পরবর্তী স্টপেজে টুক করে নেমে গেলেন। ....এরপরে আমি আরও বহুবার বাসে চেপে ওই পথে গিয়েছি; সেই ধর্ম প্রচারককে কিন্তু আর কখনও দেখতে পাইনি।

ধর্মান্তরকরণ নিয়ে আজকাল বহু কথা হচ্ছে। কে কোন্ ধর্ম গ্রহণ বর্জন করবে — সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছার ব্যাপার। সমস্যা অন্যত্র, ধর্মান্তরকরণের ফলে অনেক সময় ব্যক্তি সত্তার পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটে যায়। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির একটা নিবিড় যোগ আছে। আবার এই গোটা বিষয়টাই দাঁড়িয়ে আছে ভৌগোলিক বাস্তবতার ওপর। আমাদের দেশে সরকারিভাবে ইংরেজী ক্যালেন্ডার মানা হয়। বছর শুরু হয় জানুয়ারি দিয়ে। অথচ আসমুদ্র হিমাচলে বছর শুরু হয় বৈশাখ মাসে। নতুন ধান কাটার সময় বর্ষ গণনা শুরু হয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও জলবায়ুর সমতার জন্য সর্বত্র নতুন ফসল ঘরে তোলার সময় এখানে প্রায় একই। এটা শুধু ভারত নয়, ভারতীয় উপ-মহাদেশের বাস্তবতা। তাই একই সময়ে পাঞ্জাবে যখন বৈশাখী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ রাজ্য অসমে তখন বিহুর উৎসব। ঠিক এই বাস্তবতাকেই কোনওমতেই মেনে নিতে পারে না মিজোরাম, নাগাল্যান্ড কিম্বা মেঘালয়; যেহেতু ওরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। এই তিনটি রাজ্যই খৃষ্টানধর্মাবলম্বী হওয়ার পর নিজেদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য প্রায় ভুলেই গেছে। নিজেদের সমৃদ্ধ ভাষা থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই নাম টোনি, মোনি কিম্বা সোনি। এগুলি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বৈ তো অন্য কিছু নয়। জিজ্ঞেস করলে এরা কেউই এসব নামের অর্থ বলতে পারে না। এতে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়।

ক’দিন আগে ঔপন্যাসিক ডান ব্রাউনের ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’ নিয়ে সর্বত্র বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। সেই ঝড়ের ঝাপ্টা এসে লেগেছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয়েও। ডান ব্রাউনের উপন্যাস এবং এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খৃষ্টান অধ্যুষিত ওই তিন রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ডান ব্রাউনের উপন্যাসটির পটভূমি ছিল প্যালেস্তাইন, ইউরোপ এবং আমেরিকা। এতে যীশুখৃষ্টের পারিবারিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যীশু খৃষ্ট বিবাহিত এবং বংশধরেরা আজও বেঁচেবর্তে আছে। গোঁড়া খৃষ্টানরা এতেই আপত্তি জানায়। তাদের আপত্তির জেরেই ডান ব্রাউনের উপন্যাস ও চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ হয়। সেদিন আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের একটি ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার এই প্রয়াস যেন আসলে ইচ্ছাকৃত ভাবে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে ভুলে থাকারই প্রয়াস। যীশুখৃষ্টের সেমিটিক কিম্বা নর্ডিক পারিবারিক সত্তার সঙ্গে ভারতের মঙ্গোলয়েড কিম্বা অস্ট্রো মঙ্গোলয়েড সত্তার বিন্দুমাত্র মিল কোথাও নেই। তবু আত্মগত বিশ্বাসের জোরেই এখানকার নাগা, মিজো কিম্বা খাসিরা ইউরোপীয় সংস্কার কিম্বা সংস্কৃতির সঙ্গে একতা অনুভব করে। ধর্মান্তরকরণের সংকট এখানেই। বাইবেলে এদের সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই। থাকবেই বা কেন! মজার কথা হচ্ছে, বাইবেলের থেকেও প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে কিন্তু নাগা কিম্বা খাসিয়াদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এটাই হচ্ছে ভৌগোলিক বাস্তবতা।

এই বাস্তবতার সীমারেখা ছাড়িয়ে কখনও কল্প জগৎটা বড় হয়ে ওঠে না। সেখান থেকেই শুরু হয় যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। ৯/১১ ঘটনার পর শুনেছিলাম ত্রিপুরার এক অত্যুৎসাহী ধর্মান্তরিত আদিবাসী ছাত্রনেতা নাকি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠি লিখেছিলেন এইরকমভাবে,

“মাননীয় বুশ সাহেব, ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আমরা খৃষ্টানরা সবাই আপনাদের পাশেই আছি। খৃষ্ট শক্তির প্রতিভূরূপে আপনার নেতৃত্বে আমেরিকা এগিয়ে চলুক।...”

আমেরিকা যে মূলতঃ খৃষ্টান প্রধান দেশ — এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র গবেষকরা ভালোই জানেন, স্থায়ী পররাষ্ট্র নীতি বলে আমেরিকার কোনও নীতিই নেই। আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি যখন যেমন তখন তেমন — ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে আদর্শ বলে কোনও কিছুর স্থান নেই। খৃষ্টান প্রধান হয়েছে তো কী, সার্বভৌম দেশ হিসেবে আমেরিকা তার দেশের স্বার্থে সবচেয়ে বড় খৃষ্টানবিরোধী শক্তিতেও পরিণত হতে দ্বিধা করে না। তাই গোটা লাতিন আমেরিকা খৃষ্টান প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার দাপটে সেখানে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। সেই মেক্সিকো থেকে চিলি, প্যারাগুয়ে, নিকারাগুয়ে, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল (পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্যাথলিক দেশ), সালভাদোর, গ্রানাদা প্রভৃতি দেশ আমেরিকার দাবড়ানিতে বেসামাল। কিউবার কথা আলাদ করে আর নাই-বা বললাম। সুতরাং আমেরিকার অভিধানে বিশ্বজনীন খৃষ্টান ভ্রাতৃত্ববোধ বলে কিছু নেই। তবু আমাদের দেশে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের অনেকেই মনে করেন, আমেরিকাই হচ্ছে বিশ্বের খৃষ্টানদের পরিত্রাতা এবং খৃষ্টান আমাদের দেশে হবে না। তবে এসব কথা বলার মানে এই নয় যে, হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার কোনও বিশেষ দুর্বলতা আছে। আমি বরং দেশজ সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে বেশি চিন্তিত। আসল কথা হল, অন্য আর যে কোনও ধর্মের মতন হিন্দু ধর্মেও প্রচুর নেতিবাচক দিক আছে। সেরকম বলতে গেলে, হিন্দু ধর্মের কিছু নেতিবাচক দিক হয়ত বা রয়েছে। নিম্নবর্ণের আদিবাসী মহিলাকে আজও প্রকাশ্য দিবালোকে বিবস্ত্র করে মারধোর করা হয়। দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিনা কারণে দলিত যুবকের চোখ উপ্‌ড়ে ফেলা হয়। আজও তথাকথিত উচ্চবর্ণের অনেকে তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকজনের হাতে তৈরি খাবার খেতে চায় না। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিকটি হল বর্ণপ্রথা। স্বাধীনতার পরে এতগুলি বছর কেটে গেল — দলিত কিম্বা নিম্ন বর্ণের লোকজনদের জীবনযাত্রার সার্বিক বিকাশ আজও ঘটেনি; কিম্বা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটানো হয়নি। সঙ্গত কারণেই দলিত কিম্বা নিম্নবর্ণের লোকজনের মধ্যে প্রচুর অসন্তোষ রয়েছে। এই অসন্তোষকেই কাজে লাগিয়ে মিশনারীরা দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ধর্মান্তরিত করে। ধর্মান্তরকরণের জন্য মিশনারীরা আগে জোর জবরদস্তি করতো দিনকাল পাল্টেছে, জোর জবরদস্তি ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ তার প্রতিবাদ করবেই। আগে পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। ধর্ম প্রচারকেরা তাই নির্বিবাদে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “য়ুরোপে যখন খৃষ্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল, তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙ্গে তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে, ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।” (রাশিয়ার চিঠি, পৃষ্ঠা ১১৭) সেই সময়টা তো আর নেই। খোদ ইউরোপে এখন হু হু করে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু চার্চ। এসব হচ্ছে সত্য ঘটনা — একে খৃষ্টান বিরোধী অপপ্রচার বলা ভুল। মিশনারীরা কিন্তু এইসব ঘটনা বেমালুম চেপে যান।

আরও সত্যি কথা হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের সর্বত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে বলেই মিশনারীরা তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র তাদের ধর্মান্তরকরণের অভিযানকে আরও জোরদার করে তুলেছে। আর এই অভিযানের জন্য মিশনারীরা বেছে নিয়েছে ভিন্ন পন্থা। অসন্তুষ্ট গরীব মানুষকে প্রলুব্ধ করা খুবই সহজ। ধর্মান্তরকরণের জন্য আগে গরীব মানুষকে প্রলুব্ধ করার সেই সহজ কাজটিই বেছে নিয়েছে মিশনারীরা।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল, যে কথা আর এক দুঃস্থ হিন্দুকে শোনালে তাতে অপরাধ কিছু হয় না। বিশেষ করে দ্বন্দ্বমুখর এই জটিল সময়ে বিভিন্ন ধর্মমতের পারস্পরিক আদানপ্রদানই তো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ধর্মান্তরকরণের সময় ধর্ম প্রচারকেরা মিথ্যা ও ভন্ডামির আশ্রয় নেন। নিজ ধর্মের গুণাবলীর কথা যত না বলেন তার চেয়ে বেশী ভিন্ ধর্মের নিন্দা করেন। বিকৃত তথ্য প্রচার করেন পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে। সঙ্গত কারণেই ধর্ম প্রচারকদের নিশানা হচ্ছে অশিক্ষিত দুঃস্থ দরিদ্র জনগণ। এতে সমাজের অমঙ্গলও কম কিছু হচ্ছে না। দলিত বা আদিবাসী ছেলেমেয়েরা খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শিখে ভাল চাকুরী কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এসব ভাল মনে মেনে নিতে পারে না। এটা হিন্দুদের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু এর পাশাপাশি সত্য কথাটাও বলা দরকার। মিশনারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভাল শিক্ষাদীক্ষা পেলেও তাদের মানসিকতায় দেশজ বা ভূমিজ সংস্কৃতির প্রতি একটা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর ঠিক এই কারণেই মিশনারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে ব্যাপৃত হয়। দেশের সংস্কৃতির প্রতি কোনও টানই অনুভব করে না এরা। বিভেদের দেওয়ালটা এইভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

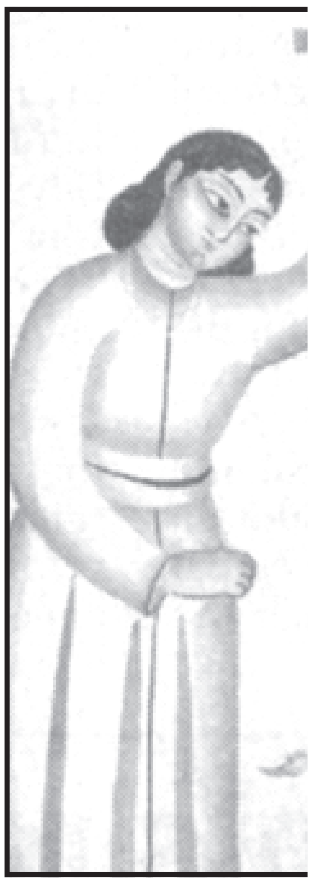

এসব কারণেই ধর্মান্তরকরণ যে কোনও দেশ কিম্বা সমাজের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে দেয়। অথচ কে-ই বা না জানে, নিজস্ব সংস্কৃতি

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ **22181995, 22180387**

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

ধ্বংসেরই নামান্তর

শুভ্র দেববর্মণ

নের লোক ঠকানো ব্যবসা। যে ব্যবসা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বত্র।
াঙ্গে যুক্ত হয়েছে নামে বেনামে বিভিন্ন বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন
কাশ্যে বলা হয় সংগঠনগুলির মূল কাজ হচ্ছে সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা
কানও অবিচার হলে তৎক্ষণাৎ ওইসব মানবাধিকার সংগঠনগুলি
হৈ চৈ শুরু করবে।

বিস্মৃত হওয়া তো আত্মধবংসের নামান্তর। প্রসঙ্গটা এখানে দেশজ সংস্কৃতি; তাই ধর্মান্তরকরণ শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে দেখা হয়। রক্ষণশীল দেশগুলি আবার ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে কড়া আইনী প্রাচীরও গড়ে তুলতে পিছপা হয় না। সৌদি আরবে বাইবেলের প্রচার ও প্রসার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইজরায়েলে কোনও ইহুদিকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না;ধর্মান্তরকরণ সে দেশে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলে গণ্য হয়। মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, জর্ডন এবং তুরস্ক প্রভৃতি দেশে ধর্মান্তরকরণ বেআইনী। অথচ আমাদের দেশে হয় জবরদস্তি নয়তো প্রলোভন দেখিয়ে গরীবগুর্বোদের খুল্লামখুল্লা ধর্মান্তরিত করা হয়। এতে আখেরে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষতি হয়।

কেনিয়ার প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (১৯৬৪-১৯৭৮) জোমো কেনেয়াট্টার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "মিশনারীরা যখন এসেছিল তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল;আর আফ্রিকানদের ছিল জমি। তারা আমাদের শিখিয়েছিল কীভাবে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে হয়। আমরা চোখ বুজে প্রার্থনা করলাম। যখন চোখ মেললাম তখন দেখি মিশনারীরা আমাদের জমির মালিক। আমাদের হাতে শুধু বাইবেল!"আশা করি এরকম অবস্থা মানেই হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার মতন ধন আর সমৃদ্ধির প্রতীক। দারিদ্র্যে জর্জরিত আলেবেনিয়া, পূর্ব ইউরোপ কিম্বা সেই লাতিন আমেরিকার কথা তখন যেন আর মনে আসে না। ...... তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ত্রিপুরার ধর্মান্তরিত আদিবাসী ছাত্র নেতার চিঠি পাঠানোর কথা শুনে পুলকিত বোধ করেছিলাম। ভাবছিলাম যে কোনও ধর্ম মানুষকে কীভাবে অবিবেচক করে তোলে। তবে এ ধরনের অদ্ভুত ঘটনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নতুন কিছু নয়।

পত্রিকায় মাঝেমধ্যে খবর বেরোয় .... হয়তো নাগাল্যান্ডের কোনও গাঁয়ে পানীয় সংকট দেখা দিয়েছে। সেখানকার গাঁওপ্রধান সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সরাসরি আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। তার আশা এই যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিম্বা এ দেশের প্রধানমন্ত্রী নন তাঁর গাঁয়ের পানীয় সংকট সমাধানের জন্য একমাত্র আমেরিকার রাষ্ট্রপতিই সক্ষম। এ যেন ঠিক সমরেশ মজুমদারের 'উত্তরা' গল্পেরই প্রতিচ্ছবি। গল্পটি এইরকম, গাঁয়ে বহিরাগত হিন্দু মৌলবাদীরা দাপিয়ে বেড়ায়। আর হাতে গোণা যে ক'জন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী আছে, তারা চার্চে প্রার্থনা সেরে সবাই মিলে খিচুড়ি খায়। তবু তারা স্বপ্ন দেখে, একদিন হিন্দু মৌলবাদীদের উৎপাত থেকে মুক্ত হয়ে সবাই সেই অফুরান দুধ ও মধুর দেশ আমেরিকায় চলে যেতে পারবে। এবং সেদিন আর খিচুড়ি নয়, রোজ প্রার্থনা শেষে সবাই ফলমূল সহ সুস্বাদু পশ্চিমী খাবার পেট ভরে খাবে।

পৃথিবীটা হয়তো সত্যি আরও সুন্দরতর হয়ে উঠতে পারতো যদি যে যার ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন থাকতো। কিন্তু সে আর হল কই। হিন্দুরা তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে মরিয়া তো, খৃষ্টানরা এমন তেড়েফুঁড়ে প্রচার চালায় যে, মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে না পারলে যেন খৃষ্টধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন। আবার কিছু মুসলমানের ধারণা এইরকম, পৃথিবীতে যদি কোনও একমেবদ্বিতীয়ম্ ধর্ম থেকে থাকে সে হচ্ছে 'ইসলাম'। বাকীরা অপবিত্র এবং বিধর্মী। বিধর্মীদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই লড়াইয়ের ফলেই শুরু হয় ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া।

ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম যে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম — এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এ কথাও মেনে নিতে কারোর কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় যে, একজন তার ধারণা বা বিশ্বাসের মতামত ভিন্ ধর্মের আর একজনকে বলে কয়ে নিজের ধর্মপথে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই পারে। একজন মুসলমান বা খৃষ্টান তার ধর্মের গুণাবলীর দরিদ্র নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি মিশনারীদের এত দরদ — সেটা কিন্তু আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ বা ইউরোপে অভিবাসিত তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলির প্রতি দেখা যায় না। হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথা যেমন কলঙ্ক, তেমনই কলঙ্কিত অধ্যায় হল খৃষ্টান ধর্মে অনুমোদিত ক্রীতদাস প্রথা। পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ক্রীতদাস প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জেনেসিস ৯ ঃ ২৫-২৭, লেভিটিকাস ২৫ঃ৪৬, এক্সোডাস ২১ঃ১-৬ এবং ৭-৯, ডেয়ুট ১৫ঃ১৭ প্রভৃতি স্তোত্রগুলি ক্রীতদাস প্রথাকেই সমর্থন করে। এর ফলেই পশ্চিমীদের মানসিকতায় গাঢ় হয়েছিল ঔপনিবেশিকতাবাদ; বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশ ওরা গড়েও তুলেছিল। আর কে-ই বা না জানে, ঔপনিবেশিকতার মানেই হচ্ছে শাসিতদের আখেরে ক্রীতদাসই বানিয়ে রাখা। আসলে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা গিয়েছে, ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া কখনও মানব সভ্যতার প্রগতির সহায়ক হয়নি। ধর্মান্তরকরণের ফলে বরং সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা আর যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ঘটেছে রক্তপাত। বিষিয়ে ওঠেছে পৃথিবীর বায়ু। ধর্মান্তরিত হলেই পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে যারা ভাবেন, তাদের ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। ধর্মান্তরিত হয়েছেন এমন কেউ নিজের বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না পৃথিবীর সব সুখ এখন তার করায়ত্ত হয়েছে;আধ্যাত্মিক বা বস্তুগতভাবে তিনি এখন বড়ই সুখী। সত্যি কথা বলতে কী, ধর্মান্তরকরণ তো দূরের কথা — দ্বন্দ্বমুখর এই অশান্ত পৃথিবীতে মেডইজি সুখের সন্ধান কেউই দিতে পারে না। ধর্মান্তরকরণ যদি এই সুখের সন্ধান দিতে পারতো তবে খৃষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টের লাগাতার সংঘর্ষ হতো না (স্মর্তব্য আয়ারল্যান্ড);শিয়া বনাম সুন্নিদের লড়াইয়ে কেঁপে ওঠতো না মুসলিম দুনিয়া; উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্বে কলুষিত হতা না হিন্দু সমাজ।

ধর্মান্তরকরণ ব্যাপারটাই হচ্ছে স্রেফ ধাপ্পাবাজি। এ হচ্ছে এক ধরনের লোক ঠকানো ব্যবসা। যে ব্যবসা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বত্র। কোটি টাকার মুনাফা জড়িয়ে আছে এই চাতুর্য ভরা ব্যবসায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নামে বেনামে বিভিন্ন বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন — যাদের সাংগঠনিক কাজকর্মের সবটাই কুহেলিকাময়। যদিও প্রকাশ্যে বলা হয় সংগঠনগুলির মূল কাজ হচ্ছে সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করা, অর্থাৎ এ দেশে সংখ্যালঘু মুসলিম বা খৃষ্টানদের ওপর কোনও অবিচার হলে তৎক্ষণাৎ ওইসব মানবাধিকার সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে হৈ চৈ শুরু করবে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারত সরকার মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে এবং সংখ্যালঘুর ওপর তখন বন্ধ হবে অত্যাচার ও অবিচার। শুনেছি অনেকটা এই কারণেই নাকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কতিপয় হার্ডকোর নেতা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। নরহত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের জন্য এইসব নেতাদের নামধাম পুলিশের খাতায় রয়েছে। এরা সবাই মোস্ট ওয়ানটেড হিসেবে চিহ্নিত। রাষ্ট্র এদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সেই সময় সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব বিপন্ন বলে শোরগোল জুড়ে দেবে। মিডিয়াতেও শুরু হবে তুমুল বিতর্ক।

এই বিষয়ে খোদ হিন্দু সংগঠনগুলিও আজকাল আর পিছিয়ে নেই। মনে পড়ে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি খৃষ্টান অধ্যুষিত রাজ্যে একদা এক আদিবাসী হিন্দু নেতা সদম্ভে আমাকে বলেছিল, "এখানকার খৃষ্টানদের ধারণা, কেবল ওদেরই ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন রয়েছে। আমরা কম যাই কীসে! আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কোনও পদক্ষেপ নিলে, দেশের কথা ছাড়ুন, বিদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশী জোরদার প্রতিবাদ ধবনিত হবে। তখন কেউ পালিয়ে পার পাবে না। আমাদেরও লবি কম স্ট্রং নয়। ভুলবেন না আজকাল আমেরিকান সিনেটেও গীতা পাঠ করেই সভা শুরু হয়।" তার কথা শুনে আমি সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

পরে ভেবে দেখলাম, সত্যিইতো সেই আদিবাসী হিন্দু নেতাটি সেদিন কিছু মিথ্যে বলেনি, আজকাল তো হিন্দুধর্মের যেন মূল ঠেক্ই হচ্ছে বিলেত ও ইউরোপ। অনাবাসী ভারতীয় ও সাহেব মেমদের টাকায় ফুলেফেঁপে ওঠছে কিছু হিন্দু সংগঠন। গরীব মানুষের অন্ন সংস্থান হোক আর না হোক, দেশের বিভিন্ন মহানগরে গজিয়ে ওঠেছে ঝাঁ চকচকে চোখ ধাঁধানো বিশাল সব জমকালো মন্দির। এসব মন্দির তৈরির টাকা পয়সাও আসছে ওই বিদেশ থেকেই। ওই বিদেশেই তৈরি হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির — এ দেশে নয়!

এটা ঘটনা — বিত্ত বৈভবে সমৃদ্ধ পশ্চিমীরা, বিশেষতঃ সেলিব্রেটিরা আজকাল প্রবলভাবেই হিন্দুধর্মের মতন প্রতীচ্য ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। ভারতীয় যোগগুরুদের এখন আন্তর্জাতিক বাজারে দারুণ কদর। মুন্ডিত মস্তক শ্বেতাঙ্গরা কপালে চন্দন তিলক লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে গড়ে তুলেছে ঢাউস সব কৃষ্ণ মন্দির। ....এও তো এক ধরনেরই ধর্মান্তরকরণ!

কট্টর হিন্দুরা গর্বোদ্ধতভাবে বলতেই পারে, 'মহান বলেই হিন্দু ধর্মের প্রতি পশ্চিমীরা আকৃষ্ট হচ্ছে।' হিন্দুধর্ম মহান কী মহান নয় সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ধর্মান্তরিত পশ্চিমীরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নতুন কোনও দিগন্ত উন্মেষে সহায়ক শক্তি হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত এমন তথ্য কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। বরং হাতে যৌন ব্যভিচারের নীল বই 'কামসূত্র' নিয়ে অতি জঘন্য উচ্চারণে 'হড়ে ড়াম হড়ে কৃষণ' বলে ওরা যখন এগিয়ে আসে তখন পালাতে ইচ্ছে করে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে যৌনতার মিশেলে ওরা যে ককটেল তৈরী করেছে — সে বিষয়ে নতুন করে আর বলার কিছু আছে কী! সেই সময় ধর্মান্তরিতদের হাতে হিন্দু ধর্মের নতুন রূপ দেখে আমাদের লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। গীতার সেই শ্লোকটির কথা তখন মনে পড়ে; যেটি শুধু হিন্দু নয়, পৃথিবীর যেকোনও ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শ্লোকটি হল, "শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুনাঃ / পরঃ ধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ / স্বধর্মে নিধনমঃ শ্রেয়ঃ / পর ধর্ম ভয়াবহঃ।। (গীতা, ৩ ঃ ৩৫) ।।

> **খোদ ইউরোপে এখন হু হু করে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু চার্চ। এসব হচ্ছে সত্য ঘটনা — একে খৃষ্টান বিরোধী অপপ্রচার বলা ভুল। মিশনারীরা কিন্তু এইসব ঘটনা বেমালুম চেপে যান। আরও সত্যি কথা হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের সর্বত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে বলেই মিশনারীরা তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র তাদের ধর্মান্তরকরণের অভিযানকে আরও জোরদার করে তুলেছে।**

সংক্ষেপিত। সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা
প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.......................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

চিঠিপত্র

রিজয়ানুর ও অর্ক

গত ২রা আগস্ট সংবাদ পত্র পড়ে একটি হিংস্র ও নৃশংসভাবে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনাটা জানতে পারলাম। সেটি অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা। তার অপরাধ কী ছিল? সে মুসলিম ধর্মের মেয়ে রেহানা সুলতানাকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল। অর্ক ও রেহেনার বর্তমানে একটি সন্তান। রেহানার পিতা নজরুল ইসলাম ও তার পুত্র মনিরুল ইসলাম এই বিবাহ মেনে নেয়নি। কারণ অর্ক হিন্দু। মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ, তারা মনে করে, হিন্দু বাড়িতে মুসলিম মেয়েরা গেলে মুসলিম ধর্মের ক্ষতি হবে। সেই ক্ষতিটা হল, একটি মুসলমান মেয়ে হিন্দু বাড়িতে গিয়ে হিন্দু সন্তান জন্ম দেবে। সেটা, মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি তে একটা বড় বাধা। অথচ উল্টোটা করতে ওরা পিছপা নয়। মুসলিম যুবকরা হিন্দুদের মতো ছদ্ম নাম নিয়ে, হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে ফুসলিয়ে বিবাহ করছে। একদিকে হিন্দু পরিবারে মুসলিম মেয়েকে না পাঠানো, অন্যদিকে হিন্দু মেয়েকে মুসলিম করে নিয়ে গিয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ানো এদের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যের পিছনে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। মুসলিম ঘরের মেয়েদের দিকে, হিন্দু যুবকরা যাতে না তাকায়, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য শাস্তি স্বরূপ অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গায়ে কেরোসিন ঢেলে হত্যার চেষ্টা। এ হল মুসলিমদের অন্দর মহলের ঘোর চক্রান্তের কথা। আমরা সকলেই জানি রিজয়ানুর রহমানের ঘটনা। রিজয়ানুর, হিন্দু মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে বিবাহ করে। ঘটনাবশতঃ রিজয়ানুর মারা যায়। কীভাবে মারা গিয়েছে, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। রিজয়ানুর মারা যাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবিধ রাজনৈতিক দলের নেতারা জঘন্য রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন। বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা পর্যন্ত, রিজয়ানুর ও তার পরিবারকে নিয়ে কতো ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন। অসংখ্য বাতি জেলেছেন তার আত্মার শান্তি কামনার জন্য। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন রিজয়ানুর-এর হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্য।

উক্ত নেতা-নেত্রীবৃন্দদের কাছে আমার প্রশ্ন, রিজয়ানুর হত্যার জন্য যে ধরনের প্রতিবাদ, সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন, অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আপনারা কী করেছেন? অর্ককে এই নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা যারা করেছে, তাদের শাস্তির দাবি নিয়ে আপনারা কতবার পথে নেমেছেন? কতোটা সহানুভূতি দেখিয়েছেন অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোড়া দগ্ধ শরীর দেখে? ইসলাম ধর্মের বলেই কী এতো কিছু করেছেন? যাতে মুসলমান সমাজের থোক ভোটটা পাওয়া যায়? আর অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু হওয়াতে আপনাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই?

শুভেন্দু সরকার, ধূলাগড়ী, হাওড়া।

সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যকারী

ক্ষমতার লোভে যে সব বুড়ো খোকারা ভারত ভেঙ্গে ভাগ করলো তারা কিন্তু একজনও বৃটিশের লাঠির ঘা খাননি। বাংলা-পাঞ্জাবের সহিংস আন্দোলন বৃটিশের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও বাংলা-পাঞ্জাবের শহীদদের বেদীর উপর যারা দরাদরি করে ক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিল তারাই গদী লাভ করেছিল বাংলা ও পাঞ্জাবীদের উদ্বাস্তু বানিয়ে, হিন্দু নারীর সতীত্ব খুইয়ে — পাকিস্তানীদের হাতে। পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে ঢুকলে নেতাজীকে গ্রেপ্তার করা হবে। নেতাজীর মৃত্যু তখনও রহস্যাবৃত। মহাত্মা গান্ধীর ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ আন্দোলনও গদী লোভী কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। তার জন্যে গান্ধীজিও আক্ষেপ করে বলেছিলেন I have committed Himalayan blunders. বৃটিশের ঘাড়ের উপর দ্বীপ রাষ্ট্র আয়ারল্যাণ্ড কি সন্ধি করে স্বাধীনতা পেয়েছিল?

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি ছিল? পাকিস্তান দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং যজ্ঞ শুরু করতে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে গেল। অর্থাৎ সমগ্র বাংলা পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সমস্ত বাংলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে হিন্দু কিলিং-এর প্রতিরোধ করে ও প্রতিশোধ নিয়ে পশ্চিমবাংলাকে পাকিস্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন নেহরু মন্ত্রীসভার শিল্পমন্ত্রী আর বাংলার শিল্পের প্রথম রূপকার হলেন ডঃ বিধান রায়। আর আজ ৩০ বৎসরের কম্যুনিস্ট কুশাসনে বাংলার শিল্পের ধবংসাবশেষের উপর চলছে প্রেতনৃত্য।

নতুন প্রজন্মের জানা প্রয়োজন আজকের কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের যে ক্রিয়াকলাপ তার মূলেও সেই পন্ডিত নেহরু ও তার সঙ্গীরা, যারা মাউন্টব্যাটেনদের পরামর্শে কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ভারতবাসীকে অবাক করে দিয়েছিলেন। আজ তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর সহ সারা ভারতকে। পাকিস্তানের আই এস আইকে দোষ দিয়ে কি লাভ? স্থানীয় মোল্লা-মৌলবীদের সাহায্য না পেলে কি মুড়ি-মুড়কির মতো একের পর এক সিরিয়াল বম্ব ব্লাষ্ট করে ভারতীয়দের হত্যা ও আহত করতে পারে? বম্বের (মুম্বই) দাউদ ইব্রাহিম কলকাতার রসিদ খান-এরা তো জন্ম লগ্ন থেকে ভারতের নাগরিক। আরও কত দাউদ ইব্রাহিম, রসিদ খানরা রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গেলাম নবী আজাদের পরামর্শে লোকসভা হামলার মাষ্টার মাইন্ডের ফাঁসির আদেশ কার্যকর না করার ফলে কংগ্রেসের মুসলিম বা মোল্লা তোষণে ভারতবাসীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে বসেছে।

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা।

খনিজ তেল

বর্তমানে আমাদের দেশ এক চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। এর প্রধান কারণ হল খনিজ তেলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। যা আমাদের বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানী করতে হয়। এই বৈদেশিক মুদ্রা অতি কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগই, খনিজ তেল আমদানী করতে ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের এই খনিজ তেল ব্যবহারের উপর কোনও পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নেই। এর সাথে মূল্যবান এই তেল ব্যবহারের বিষয়ে দেশের জনসাধারণেরও কোনও সচেতনতা নেই।

তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যেমন, (১) গাড়ি ব্যাবহার করে অকারণ ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা মারা প্রভৃতি কাজে তেলের অপব্যয় হয়।

(২) প্রফেশনাল ব্যক্তিরা কোটি কোটি টাকা আয় করে, তা সত্ত্বেও এই ভর্তুকি যুক্ত তেল ব্যবহার করে থাকে।

(৩) সরকারি ব্যক্তিরা নানা ব্যক্তিগত কাজে, এই মূল্যবান তেল অপচয় করে চলেছে।

সেকারণে আমার নিবেদন, সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত কাজে, এই মূল্যবান খনিজ তেলের উপর থেকে সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হোক। এর ফলে আমাদের দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে। খনিজ তেল ব্যবহারের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগণা।

লঘু উদ্যোগ ভারতী

গত ১১ আগস্ট স্বস্তিকাতে লঘু উদ্যোগ ভারতীর সাধারণ সভা ২৬ জুলাই, ০৮-এ অনুষ্ঠিত হয় বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সভাটি লঘু উদ্যোগের কোনও বাৎসরিক বৈঠক নয়। কিছু ব্যক্তি উদেশ্য -প্রণোদিতভাবে এই সংবাদ স্বস্তিকাতে দিয়াছে। কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে আমাদের কিছু সদস্যকে ভুল তথ্য দিয়ে ওই সভায় হাজির করানো হয় এবং কিছু সদস্যের অনুমতি না নিয়ে (যেমন, শ্রী জয়দেব নাগ — প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি) পত্রিকায় তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়, যাহা আইনবিরুদ্ধ।

যে কমিটির কথা পত্রিকায় বলা হয়েছে তা গত জুলাই ২০০৭-এ অসৎ কাজকর্মের জন্যে তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে বরখাস্ত করা হয় এবং শ্রী গোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে লঘু উদ্যোগের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। লঘু উদ্যোগ ভারতী-র সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী বিশ্রাম জামদার ও সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সম্পাদক এবং বাংলা প্রান্তের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী নন্দ কুমার শীল এবং সঙ্ঘের গণ্যমান্য অধিকারীদের উপস্থিতিতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ওই সভায় ৫৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

এই নতুন কমিটি বিগত ১ বছরে ১০০ জনের বেশি সদস্য করেছে। নতুন অফিস নির্মাণ করা হয়। রাজ্যস্তরে বিভিন্ন জায়গায় লঘু উদ্যোগের প্রসার এবং বহু বেকার যুবক যুবককে স্বনির্ভর হতে সাহায্যে করা হয়। আগামী কিছুদিনের মধ্যে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন পরামর্শদাতা রাখা হয়েছে যাতে সদস্যদের ব্যবসায়িক কাজে বেশি করে পরিষেবা দেওয়া যায়।

নিম্নে বর্তমান কমিটির নাম এবং পদ দেওয়া হল —

(১) জয়দেব নাগ — প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, (২) পান্নালাল পাল — প্রাক্তন সভাপতি, (৩)অনন্ত মজুমদার — বর্তমান সভাপতি, (৪) অপূর্ব মুখার্জী — সহ-সভাপতি, (৫) শক্তিপদ মাইতি — সহ-সভাপতি (৬) সমীর কুমার পাল — সাধারণ সম্পাদক, (৭) অজিত নন্দী — সম্পাদক, (৮) রাধানাথ চক্রবর্তী — কোষাধ্যক্ষ, (৯) অশ্বিনী সিন্হা — কার্যালয় সম্পাদক, (১০) সরোজ গিরি — সংগঠন সম্পাদক, (১১) শিবু মালাকার — কার্যকরী সদস্য, (১২) প্রবীণ আগরওয়াল — কার্যকরী সদস্য।

— **অনন্ত কুমার মজুমদার,** সভাপতি, লঘু উদ্যোগ ভারতী — পঃ বঃ।

স্বাধীনতার ষাট বছরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাণপ্রতিম পাল

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয়রা চেয়েছিল এমন একটা শিক্ষা নীতি যা ভারতকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। ভারতের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ছোঁয়া লাগবে। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে ভারত হয়ে উঠবে এক শক্তিধর রাষ্ট্র। আজ স্বাধীনতার ষাট বছর পরে ভারতবাসীকে কি আমরা ঠিক সেই ধরনের শিক্ষা দিতে পেরেছি?

টমাস ব্যারিংটন মেকলের মিনিট অন এডুকেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নয়, ইংরেজদেরই স্বার্থ সিদ্ধি। আর তা ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় ওতঃপ্রতোভাবে মিশে যায়। চল্লিশ থেকে আশির দশকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু চড়াই-উতরাই ঘটেছে। সেই সময় ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মত্রে বেশ কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যারা দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়। তাছাড়া নেহেরুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা পর্ষদও শিক্ষায় পথ প্রদর্শকের কাজ করেছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর তৈরি হয়েছিল জুনিয়ার এবং হাইস্কুলকে নিয়ে। তৎকালীন দেশের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশকে অটুট রাখতে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে দরকার উচ্চ শিক্ষার। স্বাধীনতা লাভ করার পর আমরা যা করব ভেবেছিলাম, কাজে তা কতটা করতে পেরেছি তা আজ আমাদের কাছে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার আওতায় আনতে চেষ্টা করবে সরকার। কিন্তু আশির দশকে প্রায় ৫২ শতাংশ (৮ কোটি ২০ লক্ষ) ছেলে-মেয়ে ছিল স্কুলের বাইরে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার আগেই প্রায় ৪৪ শতাংশ বিদ্যার্থী স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। আর মাত্র ৩৫ শতাংশ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এগিয়েছে। মারাত্মক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে। এদের মধ্যে স্কুল ছুটের হার ভয়ানকভাবে বেশি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ঘোষণা করা হয় ১৯৯৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা অবশ্যই দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়নি। ফলে স্কুলছুটের সংখ্যাও কমেনি।

জনমত

১৯৫০-৫১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের মোট ব্যয়ের ৪৩ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষায়। আর ২৯.৭ শতাংশ বরাদ্দ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ প্রাথমিক স্তরের জন্য বরাদ্দ কমে দাঁড়ায় ২৭ শতাংশে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দের অর্থ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক মিলিয়ে মোট শিক্ষা ব্যয়ের ৬০ শতাংশের নীচে নেমে যায়। শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে ভারত বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের পিছনে। শিক্ষায় ভারতের তুলনায় কোরিয়া, থাইল্যান্ডের মতো দেশ সাতগুণ ব্যয় করে। প্রতিবেশি দেশ শ্রীলঙ্কা ছয়গুণ এবং মালয়েশিয়া দশগুণ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করে। স্বাধীনতার ষাট বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিরাট দেশে শিক্ষা মাধ্যমের বিভিন্নতা ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। কোনও ভাষাই সর্বভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ষাট বছরে গড়ে ওঠেনি।

স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে ভারতে যে ধরনের বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা ছিল, আজ তা কার্যত ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফলে পরীক্ষায় মূল্যায়নের মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতের মত বিশাল দেশে মোট ৪ থেকে ৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এই হার অনেকটাই কম। এছাড়া চিলি, পেরু সহ অনেক ল্যাটিন আমেরিকান দেশে এই ব্যয়ের পরিমাণ ২০ শতাংশেরও বেশি রয়েছে। ভারতীয় মেধার সুনাম রয়েছে সারা দুনিয়ায়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, জাত-পাত, আঞ্চলিকতা এবং স্বজন পোষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো কুখ্যাত হয়ে পড়েছে।

নববই-এর দশক থেকে ভারতবর্ষে উদারিকরণের ঢেউ এসে লাগতে থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব বেশ ভাল রকম দেখা যায়। মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেসরকারিকরণের হাত ধরে ব্যবসায়ীকরণ পুরোপুরি ঢুকে পড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে। ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে রাজ্যে রাজ্যে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নবগঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুরে ২ থেকে ৩ কামরা বিশিষ্ট ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়। সরকারি মদতে ক্রমশ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বিপুল টাকার বিনিময়ে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম চালু করে। শুধু তাই নয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ‘সেল্ফ ফাইনান্সিং কোর্স’ চালু হয়। এই বেসরকারীকরণ তথা বাণিজ্যকরণ ক্রমশঃ

(এরপর ১৩ পাতায়)

পরম্পরা

হিমালয়ের জাগ্রতা দেবীমা নয়নাদেবী

সোমনাথ নন্দী

ঘটনা দুটি অতি সাম্প্রতিক। সংঘটন স্থল ভারতের দুই জাগ্রত তীর্থক্ষেত্র। প্রথমটি দেশের পূর্বভাগে ওড়িশার পুরী। দ্বিতীয়টি উত্তরভাগে হিমাচলের নয়না দেবী। মর্যাদা, গুরুত্ব ও জনাকর্ষণের বিচারে দুটি তীর্থই প্রভাবশালী। গত দুই মাসের মধ্যে দুটি তীর্থে পাদপিষ্ট হয়ে মারা যায় কিছু পুণ্যলোভী মানুষ।

তীর্থক্ষেত্রে পাদপিষ্টের ঘটনা বহুকাল আগে থেকেই ঘটে আসছে বিশ্বে। ভারতে সংখ্যাটা মনে হয় একটু বেশি। এ কি নিছক ধর্মোন্মাদনা, না ধর্মীয় সচেতনতার অভাব, না আপন ধর্মের বেদীতলে আত্মবলিদান। আত্ম বিসর্জনের ঘটনা এদেশে মধ্যযুগে আকছার ঘটলেও, একবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে নিছক মনোবিকার বা বাতিক গস্ততা ছাড়া কিছু নয়।

গত ৪ জুলাই পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রার সময় চার পুণ্যার্থীর পাদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু এবং তার ঠিক পরের মাসে হিমাচলের নয়না দেবী মন্দিরে গত ৩ আগস্টে একইভাবে ১৪৬ জন প্রাণ হারানো প্রায় সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যথিত ও হতচকিত করে তোলে। যদিও দুটি দেবালয়ে মন্দির ও রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাত্রী যাতায়াত পরিচালনার সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে আচম্বিতে শত সতর্কতা থাকলেও। পার্বত্য তীর্থ নয়না দেবীর মন্দিরে পাদপিষ্টের ঘটনা সম্পূর্ণ পাহাড়ী ধসের গুজব ঘিরে। দুদিকে গভীর খাদ। মাঝে স্বল্প পরিসরের ঢালু পাহাড়ী পথ। ভীত সন্ত্রস্ত পলায়মান যাত্রীদের পায়ের চাপের বলি হয় শতাধিক পুণ্যার্থীর জীবন। গভীর খাদে পড়ে যায় অনেকে।

ঘটনাটি এতই মর্মন্তুদ যে বহু মানুষ এই প্রতিবেদককে জিজ্ঞাসা করেছেন বাস্তবে কে এই নয়না দেবী? তিনি পৌরাণিক না গ্রাম্য কোন দেবী? সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম মহাশক্তি দুর্গার তিনি হিমাচলী এক রূপ। আসলে পুরীর জগন্নাথ মন্দির বিষয়ে সাধারণ মানুষ যতটা জানেন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচলের অধিবাসীরা ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা ততটা নয়না দেবী-মন্দির সম্বন্ধে অবহিত নন। অন্যতম কারণ বিভিন্ন এমন পত্রিকা বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকে নয়না দেবী বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা। হিমাচলকে ভূস্বর্গের অভিধা দেওয়ার কুণ্ঠাবোধ। অথচ হিমাচলের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী অনেক ক্ষেত্রে কাশ্মীরকেও অতিক্রম করে যায়, একথা স্বঘোষিত পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মানতে চান না বা দেখেও না দেখার ভান করেন।

মূল বাস্তব হল হিমাচলের গরিমা তার নৈসর্গিক দৃশ্যে। সর্বত্রই যেন মরমী শিল্পীর নিপুণ তুলির টানে উঠে আসা সৌন্দর্যের বর্ণনাতীত কাব্যিক ব্যঞ্জনা। সর্বত্রই প্রকৃতির স্নেহঝরানো অভিব্যক্তি। অপরূপ প্রাণোচ্ছ্বল দ্যুতি। একদিকে তুষার কিরীট শোভিত হিমালয়ের শৃঙ্গমালা। অন্যদিকে মখমলের মতো নয়ননন্দন তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা। তারই বুক চিরে মিহি জরির রেখার মতো সর্পিল গতিসম্পন্না স্বচ্ছসলিলা ফেনিল তটিনী। মধ্যে মধ্যে পাইন-চির-দেওদারের সুবিন্যস্ত চিরহরিৎ বনানী।

হিমাচলীদের হিমাদ্রি সম বিশ্বাস এস্থান শিব-শিবানীর প্রিয় আবাসভূমি। কৈলাসের পর তাঁদের পছন্দের লীলাভূমি। একেবারে অমূলক নয়। হিমাচলীদের আস্থার সূত্র মেলে ব্রহ্মপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি কাহিনীতে। বলা হয়েছে ভগবান শঙ্কর ও পার্বতী একবার কৈলাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এক নিরালা নির্জন স্থানের সন্ধানে। চলতে চলতে থমকে যান তাঁরা হিমালয়ের এক মনোরম স্থানে। জায়গাটা যেন প্রকৃতির মানস প্রতিমা। পছন্দ ঈশানীর। ইন্দুমৌলিকে নিয়ে রচনা করলেন তাঁদের দ্বিতীয় আবাস।

উত্তরাখন্ডের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের মতো হিমাচলে হিমালয়কে বলা হয় প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের অপরূপ প্রদর্শনশালা। বাস্তবিকভাবে এখানে এমন অনেক মন্দির দেখা যায় যাদের বয়স হয়তো দেড় হাজার বছর অতিক্রম করেছে। আজও ছড়িয়ে আছে ৬০০০ মন্দির সারা হিমাচল প্রদেশ জুড়ে। অস্তিত্বের একমাত্র কারণ এ অঞ্চলে মুসলিম অভিযান না হওয়া। হিমাচলীদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই তাঁদের দেবালয়ের দেবতা। তা তিনি গ্রাম্য দেবতা বা পৌরাণিক দেবতা যাইই হোন। ব্যাধি, মহামারী, পশুমড়ক, ভূমিকম্প, পাহাড়ি ধস, প্রেতাবেশ প্রভৃতি যাই ঘটুক, হিমাচলীদের বিশ্বাস, এসব দেবতাদের কোপের কারণে। সেজন্য তারা দেবদেবীদের প্রসন্নতা অর্জনে তৎপর হন। তবে বিশ্বাস-ভক্তির ক্রমপর্যায়ে দুর্গা বা দেবীশক্তির স্থান সর্বাগ্রে। তারপর শিব, বিষ্ণু, হনুমান, শীতলা ও নাগদেবতার স্থান।

নয়নাদেবীর মন্দির

> “ নয়না দেবী দুর্গার আর এক রূপ। কারণ জাগ্রত পীঠ। প্রচলিত জনশ্রতি হল দেবী সতীর নয়ন এখানে পড়েছিল। যদিও তন্ত্রচূড়ামণির পীঠ নির্ণয়ে, শিবচরিতে এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বাসের কোনও বিকল্প নেই। তাই হিমাচলীদের বিশ্বাস ভক্তির শক্তিতে প্রাণবন্ত নয়না দেবীর শক্তি পীঠ। ”

প্রত্যেক হিমাচলী পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেবী পার্বতীর প্রতি দেখা যায় এক কোমল অনুভূতি। বাংলার মতো দেবী তাঁদের কাছে কখনও মা, কখনও বা কন্যা, কখনও বা দুর্গতিহারিণী। সেজন্য মহিষমর্দ্দিনী মূর্তির প্রতি হিমাচলীদের আছে অদৃশ্য আকর্ষণ।

নয়না দেবী এই দেবী দুর্গার আর এক রূপ। কারণ জাগ্রত পীঠ। প্রচলিত জনশ্রতি হল দেবী সতীর নয়ন এখানে পড়েছিল। যদিও তন্ত্রচূড়ামণির পীঠ নির্ণয়ে, শিবচরিতে এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বাসের কোনও বিকল্প নেই। তাই হিমাচলীদের বিশ্বাস ভক্তির শক্তিতে প্রাণবন্ত নয়না দেবীর শক্তি পীঠ।

হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় নয়না দেবীর মন্দির। রাজধানী সিমলা হতে জেলা শহর বিলাসপুরের দূরত্ব ৯০ কিমি। চন্ডীগড় মানালী জাতীয় সড়কের ওপর। শতদ্রু নদীর তীরে।

বিলাসপুর হিমাচলের অন্যতম জেলা। আয়তন ১১৬১ বর্গকিলোমিটর। এর উত্তরে মান্ডি ও হামিরপুর জেলা। পশ্চিমে হামিরপুরের একাংশ ও উনা। দক্ষিণে সোলান এবং পূর্বে সোলানের একাংশ ও মান্ডি জেলা।

ভৌগোলিকভাবে বিলাসপুর শহর সমুদ্র তল হতে ২০০০ ফিট উচ্চতায়। তবে নতুন বিলাসপুর শহরের থেকে পুরানো শহরের শোভা ভ্রমণার্থীদের মুগ্ধ করে। আয়তকারে গঠিত পুরনো বিলাসপুর জুড়ে আছে উর্বর সবুজভূমি, অনুচ্চ শৃঙ্গ শোভিত পর্বত মালা ও অগণিত অপ্রশস্তা স্রোতস্বিনী। বিলাসপুর জেলা জুড়ে আছে হিমাচলীদের ভাষায় সপ্তধর। সাত অনুচর পর্বতমালা। এই সপ্তধর হল-ধর নয়না দেবী, ধরকোট, ধরটিউনি, ধর-বন্দলা, ধর-ঝিঞ্জিপুর, ধর-রতনপুর ও ধর-বাহাদুরপুর। সবগুলিই পার্বত্য শহর। তাই পূর্বে বিলাসপুরের রাজাদের বলা হত সপ্তধরের প্রভু।

নয়না দেবী-ধরে ছিল পূর্বতন রাজাদের রাজধানী কট-কাহলুর। অর্থ রাজাদের আবাস, সেই সূত্রে বর্তমান নাম বিলাসপুর। অন্য সূত্র বলে এ অঞ্চলে মহর্ষি ব্যাসদেবের সাধন গুহা থাকার কারণে প্রথম নাম ছিল বিয়াসপুর। পরে উচ্চারণ অভিঘাতে বিলাসপুর।

নয়না দেবী - ধরে (নয়না দেবী পর্বত) ৩৫৯৫ ফিট উচ্চতায় ত্রিকোণাকার পর্বতশৃঙ্গে বিরাজমান মহামায়া নয়না দেবীর মন্দির। মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্তিতে বিরাজিত তিনি। নীচের নয়না দেবী শহর থেকে মন্দির যেতে ভাঙতে হয় ৪ কিমি পাহাড়ী চড়াই। পর্বত শিখরে মায়ের ১৩০০ বছরের দেবাঙ্গন।

মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পাঞ্জাবের রোপারে বিখ্যাত গুরুদ্বার আনন্দপুর সাহিবের দৃশ্যাবলী স্পষ্ট ভেসে ওঠে। অন্যদিকে দৃশ্যমান ২০ কিমি দূরে ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধের সৃষ্ট জলাধার গোবিন্দপুর হ্রদ।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন বিলাসপুরের চন্দ্রবংশীয় শাসক রাজা বীরচাঁদ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে।

দেবালয় নির্মাণের নেপথ্য জনশ্রুতি হল — রাজা বীরচাঁদের এক আহির গোপালক নয়না একদিন দেখতে পায় পাহাড়ে চড়ার সময় তার কয়েকটি গরু একটি পাথরের ওপর স্বেচ্ছায় দুধ বর্ষণ করছে। বিস্মিত নয়না রাজাকে ঘটনাটি জানায়। রাজা বীরচাঁদ ওই স্থান খনন করে একটি দুর্গা মূর্তি পান। পরে সেখানে একটি মন্দির তৈরি করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। নয়নার পথে দেবীর নামকরণ করেন নয়না দেবী। প্রাতঃবন্দনীয় শিখগুরু গোবিন্দ সিংজী মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আপন কৃপাণ এখানে দেবীর পদতলে রাখেন। দেবী দিব্য মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে সেই কৃপাণ স্পর্শ করেন ও তাঁকে আশীর্বাদ দেন।

সে কারণে বহু শিখ দর্শনার্থী মন্দিরে আসেন দেবীর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে।

নয়না দেবী মন্দির প্রাঙ্গণে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা নতুন নয়। ১৯৭৮ সালে একবার প্রবল বর্ষণে নয়না দেবী পর্বতে বিশাল ধস নামে। নয়না দেবী মন্দিরের নীচের উপত্যকায় প্রায় ১০০ একর জমি ধসের ফলে বড় বড় পাথর ও মাটিতে চাপা পড়ে যায়। লাগোয়া গ্রামে প্রায় একশ বাড়ি ধবংসস্তূপে চাপা পড়ে। হতাহত হয় বহু অধিবাসী।

প্রতি বছর নয়না দেবী দর্শনে আসেন প্রায় দশ লক্ষ ভক্ত দর্শনার্থী। শ্রাবণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত শ্রাবণী নবরাত্রি উপলক্ষে পুণ্যার্থী সমাগম বাড়ে। পাহাড়ের তলদেশে নয়না দেবী শহরে ছোট খাটো মেলাও বসে।

হিমাচলীদের ধারণা ওই সময় দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন এখানে, গত ২ আগস্ট ছিল উক্ত নবরাত্রির প্রথম দিনে। নবরাত্রির প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজার পুণ্যার্থী আসেন মন্দিরে মায়ের দর্শনে। এদের মধ্যে হিমাচলী ছাড়াও পাঞ্জাব ও হরিয়ানাবাসীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। কারণ নয়না দেবীর বিপুল মাহাত্ম্য।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাশিয়ার বর্তমান নতুন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ ভারতীয় যোগের শুধু ভক্তই নন, তিনি তাঁর ব্যস্ত সময়সূচী থেকে সময় বের করে নিত্য নিয়মিত যোগাভ্যাস করেন বলেও জানা গেছে। তার আগের রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন ছিলেন জুডো ক্যারাটেতে পারঙ্গম। প্রসঙ্গত, শ্রী মেদভেদেভ এবছরের ৭ মে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণ করেন, বয়স মাত্র ৪২ বছর। পুতিনের আমলে রাশিয়ায় জি ডি পি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবার নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর দেশবাসীকে 'যোগ' — প্রাণায়াম ও যোগাসন উপহার দেবেন বলেই ধারণা। প্রাণায়াম ও যোগাসনের সঙ্গে তিনি ওম্-মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ করেন। শ্রী মেডভেদেভ আরও জানিয়েছেন, এই যোগাসনের ফলে তাঁর রোজকারের কাজে এক উদ্দীপনা যোগায় যা চাপ কমাতে সাহায্য করে। একথা মস্কোতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন। তিনি ভালোভাবে শীর্ষাসন করতে পারেন বলে নিজেই জানিয়েছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Design's For Modern Living
NEYCER
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

দুর্গা পুজোর খুঁটিনাটি সরঞ্জাম সংগ্রহে মেয়েরা

প্রীতি বসু

মেয়েরাও টব-খুলি-হাঁড়ি তৈরিতে ব্যস্ত।

এসে গেল চিরাচরিত উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো মানেই পুজোর জন্য মাটির প্রতিমার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপাচার। দুর্গাপুজোর সেইসব খুঁটিনাটি সরঞ্জাম সংগ্রহ কতখানি এগোচ্ছে তা দেখবার জন্য গ্রামের কাদা-মাটির পথ বেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোদাখালি থানার ডোঙ্গারিয়া গ্রামে হাজির হলাম। স্থানটি যে কলকাতা থেকে খুব দূরে তা নয় ঠিকই। তবে যাতায়াতের যে খুব সুবিধা আছে তা বলতে পারি না। কলকাতার বড় গঙ্গার ধার অর্থাৎ বাবুঘাট থেকে ৭৫ নং বাসটি এ পথে যাতায়াত করে। তবে বাসের সংখ্যা খুবই কম। তাই একটা বাস ধরতে না পারলে আর একটা বাসের জন্য হাপিত্যেশ। নোদাখালির ডোঙ্গারিয়া গ্রামের বছর চল্লিশের পালেদের মেয়ে-বৌ হাসিখুশী ভারতীদি কিন্তু সে কথা মানতে রাজি নয়। তিনি বলেন কেন বাবা, গদিয়ালা ২৪ নম্বরের বাসটি তো আছে। ভাবলাম হায়রে, ঘরে বা গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করা ঘরের বৌ ভারতীদিকে কি করে বোঝাই — ৭৫ নম্বরের বাসের ভাড়া দিতেই মানুষকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়, তার উপর আবার গদিয়ালা বাসের ডবল ভাড়া।

যাই হোক, শ্রাবণ মাসের ভরা বর্ষাতেই একদিন ভারতীদির বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ভারতীদির উঠোন সব-সময়ই মাটির তৈরি কাঁচা ও পোড়ানো হাঁড়ি-কলসী-টবে ভরা থাকে। সেই উঠোনেরই একাংশে ছাউনি দেওয়া। সেই ঢাকা দেওয়া অংশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ভারতীদি মাটির টব তৈরিতে ব্যস্ত। আমাকে দেখে কাজে হাত চালাতে চালাতেই ছেলেকে বললেন — একটা কিছু বসতে এনে দে। ছেলে বেশ একটা আধুনিক প্লাস্টিকের চেয়ারই এনে দিল। বসে বললাম দুর্গাপুজোর জন্য কি তৈরি করছেন। টবে মাটি লেপতে লেপতেই উত্তর করলেন, দুর্গাপুজোর জন্য তো নিজে কিছু তৈরি করি না। পুজোর দেবীঘট, যাগ হাড়ি, ধুনোচুর প্রদীপ, দেড়কো প্রভৃতি সরঞ্জাম শুধু হাতে তৈরি করা যায় না। চাকি লাগে। আমাদের আবার মেয়েরা চাকিতে হাত দেয় না। কাজেই আমি চাকির কাজটা করতে পারি না। আর আমার ঘরের মানুষ যে করবেন, তিনি তো মিলে রাত ডিউটি করেন, এসব কাজে হাত দিতে চান না। বললাম — আপনি এসব টব, খুলি, হাঁড়ি — কি শুধু হাতেই করেন? বললেন — হ্যাঁ এসব তো হাতে দিয়েই হয়। কথাবার্তা বলে ও দেখে বুঝলাম — দুই মেয়ে, ছেলে ও স্বামী নিয়ে সংসার ঘরণী কাজকর্ম করে দু-পয়সা রোজগারের জন্য যথেষ্ট উৎসাহী। বললাম দুর্গাপুজোয় চাকি চালানোর ব্যবস্থা করে পুজোর সরঞ্জাম তৈরি করে তো বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে পারেন। বললেন, করি তো। অনেকেই আসে দেবীঘট, ধুনোচুর, কুনকো, হাঁড়ি — এসব কিনতে। এলে একটু অপেক্ষা করতে বলি বা পরে আসতে বলি। আমি এই পাড়াতেই যে সব বাড়িতে এগুলো তৈরি হয় তাদের থেকে কিনে এনে, একটু বেশি দামে বিক্রি করে কিছু লাভ করি। এ বছর পেয়েছেন? এখনো তো সময় আছে, দেখা যাক্। দেখলাম, মাটির শিল্প কাজে পয়সা রোজগারের থেকেও যেন শিল্প তৈরি করতেই তিনি বেশি উৎসাহী। হাতে যেগুলো করা যায় সেগুলো করছেনই। উপরন্তু পুজোর সরঞ্জাম তৈরীতেও যেন বেশ উৎসাহী। কিন্তু তৈরিতে বাধা এই সংস্কার — চাকিতে মেয়েরা হাত দেবে না'।

অঙ্গনা

গেলাম ডোঙ্গারিয়া স্কুলের পিছনের পাল বাড়িতে — সামনেই নিকোনো উঠানে চাকি রয়েছে, আর এক মাঝবয়সী মহিলা গাদা করা মাটি পা দিয়ে চটকাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম — তোমাদের এখানে দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় না? তিনি উত্তর করলেন না, হাতের ঈশারায় ভিতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম — চারদিকেই কিছু না কিছু মাটির জিনিসপত্র শুকোচ্ছে। বাড়ির মেজ বৌ মিনতি পাল বেরিয়ে এসে দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিয়ে বসতে বললেন। বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম — আপনাদের এখানে দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় না? উত্তর করলেন — আমাদের এদিকটাতে তো খুব একটা দুর্গাপুজো হয় না। বাইরে থেকে অর্ডার পাই। তবে হ্যাঁ, চিরদিনই দুর্গাপুজোর সরঞ্জাম তৈরি হয়। আপনাদের এসব কে তৈরি করেন? বললেন — আমরা তিন জা (মিনতি পাল, জ্যোৎস্না পাল ও শ্যামলী পাল) মিলেই দুর্গাপুজোর সরঞ্জাম তৈরিতে হাত লাগাই।

আপনারা সংসারের মাঝে কিভাবে এসব তৈরি করেন? আমরা সকাল ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত মাটির কাজ করি। তারপর সংসারের রান্না-বান্না ক'রে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাও স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার মাটির কাজে হাত দিই। তবে দুর্গাপুজো এসে গেলে আমাদের মাটির কাজের সময়টা একটু বেশি দিতে হয়।

দুর্গাপুজোর কতদিন আগে থেকে আপনারা পুজোর সরঞ্জাম তৈরিতে হাত দেন।

সাধারণতভাদ্রমাসের প্রথম হপ্তা থেকেই আরম্ভ করে দিই। তবে পুজো এগিয়ে এলে শ্রাবণেই আরম্ভ করি। তবে দিন যত এগিয়ে আসে, তখন অর্ডারী জিনিস দিয়ে দেবার জন্য আমাদের যথেষ্ট সময় এ-কাজে দিয়ে ও যথেষ্ট পরিশ্রম করেই আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় আমাদের সত্তর-আশি বছরের শাশুড়িও কাজে হাত দেন।

জিজ্ঞেস করলাম — কীভাবে জিনিস তৈরি করেন?

চাকাতেই জিনিসটা তৈরি হয়, তবে সংস্কারবশত চাকাতে মেয়েরা হাত দেয় না। কিন্তু মাটি তৈরি, কাঁকর বাছা, শেপ করা প্রভৃতি কাজগুলো আমরা মেয়েরা করে দিই। পুরুষরা চাকার কাজটা করে। চাকা থেকে তুলে রঙ করা, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজগুলো আমরাই করি।

প্রত্যেক পুজোয় কি রকম অর্ডার পান?

আমাদের তিন-চারটি সার্বজনীন পুজো ধরা আছে, ফি-বছরই তাঁরা অর্ডার দেন।

সরঞ্জাম বলতে আপনারা কি কি দেন?

হাঁড়ি, ঘট, মালসা, দ্বার-ঘট, দেবীঘট, কুনকো, ধুনোচুর (ধুনুচী) প্রদীপ, দেড়কো প্রভৃতি।

প্রত্যেক পুজো থেকে কত টাকা পান?

মোটামুটি তিনশো টাকা।

সরঞ্জাম তৈরিতে আপনাদের কিরকম খরচা পড়ে?

আজকাল মাটিও কিনতে হয়, তাই আগে ৭৫ টাকার মতো লাগতো, কিন্তু এখন ১০০ টাকার মতো লাগে।

আয়ের টাকাটা আপনারা কিভাবে ভাগ করেন?

ভাগাভাগি কিছু হয় না। টাকাটা বাড়ি ঘর সারানো, পড়ানো প্রভৃতি কাজেই ব্যয় হয়।

এই যে দুগ্গা পুজোর সময় বেশি করে খাটেন, তাতে বিরক্তি আসে না?

ওমা বিরক্তি আসবে কেন?

প্রথম কথা মায়ের কাজ করে একটা আলাদা আনন্দ পাই। আর ভাবি টাকাটা পেলে সংসারের উন্নতিতেই লাগবে।

এসময় মিনতিদেবী একটু হেসে বললেন, একটা কথা বলে রাখি — চাকে আমরা হাত দিই না ঠিকই, কিন্তু আগুনে পোড়াবার সময় কিন্তু পুরুষদের সাথে আমরা সমান তালেই কাজ করি।

সাধারণত আপনারা পুজোর কতদিন আগে পর্যন্ত সরঞ্জাম তৈরি করেন?

সাধারণত পনেরো দিন আগে পর্যন্ত করি, তবে যে বছর বর্ষা-বাদল বেশি হয় সে-সময় শেষ করার দিন ঠিক থাকে না।

শুধু কি পালবাড়ির মেয়ে বৌ-বলে, নাকি পয়সা রোজগারের জন্যই কাজ করেন?

না, না, তা কেন? বললাম তো মায়ের কাজের আনন্দে কাজ করি। আর ভাবি এই শিল্পটাকে যথেষ্ট উন্নত করবো।

উঠবার আগে জিজ্ঞেস করলাম — আপনাদের পড়াশুনো?

সকলের সামনেই সলজ্জভাবে মিনতি দেবী উত্তর দিলেন, সইটুকুই কেবল করতে পারি।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। ষোল

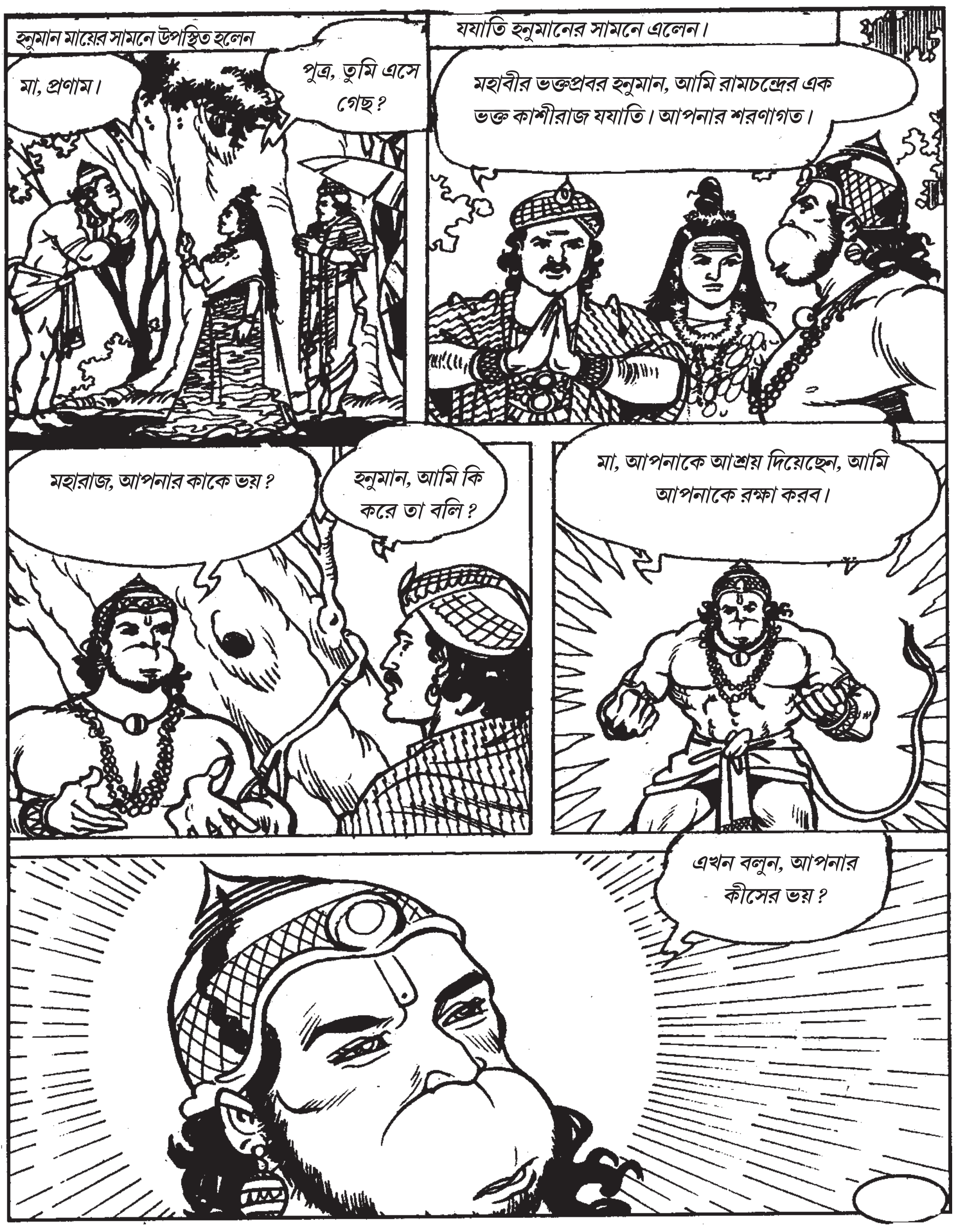
হনুমান মায়ের সামনে উপস্থিত হলেন
মা, প্রণাম।
পুত্র, তুমি এসে গেছ?
যযাতি হনুমানের সামনে এলেন।
মহাবীর ভক্তপ্রবর হনুমান, আমি রামচন্দ্রের এক ভক্ত কাশীরাজ যযাতি। আপনার শরণাগত।
মহারাজ, আপনার কাকে ভয়?
হনুমান, আমি কি করে তা বলি?
মা, আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আপনাকে রক্ষা করব।
এখন বলুন, আপনার কীসের ভয়?

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সভা

সংবাদদাতা ।। গত ১৭ আগষ্ট কলকাতায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির কার্যালয়ে সমাজ সেবা ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ)-র ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি বিশ্বনাথ মুখার্জী। সভায় প্রধান অতিথি রূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সমবেত গীত এবং সুভাষিতম্-এর মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সূচনাপর্বে সকলের হাতে রাখী বাঁধা হয় এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রাখীর তাৎপর্য সংক্ষেপে বলেন। ইতিমধ্যে পরিচয় পর্বে সভাপতি মহাশয় মঞ্চস্থ কয়েকজনের পরিচয় করিয়ে দেন এবং পরে সকলে নিজ নিজ পরিচয় দেন। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৭ জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সমাজসেবা ভারতীর বার্ষিক সভায় ভাষণরত রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ সেবা ভারতীর সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আঢ্য গত বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কোষাধ্যক্ষ অহিজিৎ (পবন) চৌধুরী গত বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণ সভায় পেশ করেন এবং আলোচনার পর তা অনুমোদিত হয়।

সভায় আগামী বছরের জন্য কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। নবগঠিত সদস্যরা হলেন সভাপতি — বিশ্বনাথ মুখার্জী, সহ সভাপতি — সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ সুনীল সেন, সুব্রত সামন্ত ও শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ, সংগঠন সম্পাদক — ডাঃ গোপাল কর, কোষাধ্যক্ষ — অহিজিৎ চৌধুরী, কার্যালয় সম্পাদক — তপন গাঙ্গুলি, সদস্য — ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক, মোহনলাল পারেখ ও অলোক মুখার্জী। সহ সভাপতি সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

কর্মচারী সঙেঘর মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার পর রাজ্যেও একই রকম বেতন কাঠামো চালু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘ মুখ্যমন্ত্রীকে এক স্মারকলিপি দিল। রাজ্যের জন্য নতুন করে পঞ্চম বেতন কমিশন গঠন না করে কেন্দ্র সরকারের সংশোধিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী পে-স্কেল ও অ্যালউন্স সহ ১ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমানুপাতিক হারে প্রয়োগ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দাবি জানিয়েছে কর্মচারী সঙ্ঘ। সঙ্ঘের যুক্তি হল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা একই ভোগ্যপণ্যের বাজার থেকে কেনাকাটা করে থাকে। বেতনে সমতা এলে বাস্তবে জীবনযাত্রায় সমতা আসতে পারে। এটাও তারা উল্লেখ করেছেন যে, এর ফলে রাজ্য সরকারের সাম্মানিক অনুদান, বেতন ও ভ্রমণ ভাতা খাতে পে-কমিশনের জন্য যে ব্যয় হবে তাতে কয়েক কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। রাজ্য সরকার তাদের প্রস্তাব ও দাবি শীঘ্র বিবেচনা করে দেখবেন বলে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘের নেতারা আশাপ্রকাশ করেছেন।

লঘু উদ্যোগ ভারতীর বর্তমান সমিতি

লঘু উদ্যোগ ভারতীর পক্ষ থেকে বর্তমান সমিতির পদাধিকারীদের নাম জানানো হয়েছে।

জয়দেব নাগ — প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পান্নালাল পাল — প্রাক্তন সভাপতি, অনন্ত মজুমদার — বর্তমান সভাপতি, অপূর্ব মুখার্জী — সহ সভাপতি, শক্তিপদ মাইতি — সহ সভাপতি, সমীর কুমার পাল — সাধারণ সম্পাদক, অজিত নন্দী — সম্পাদক, রাধানাথ চক্রবর্তী — কোষাধ্যক্ষ, অশ্বিনী সিন্‌হা — অফিস সম্পাদক, সরোজ গিরি — সংগঠন সম্পাদক, শিবু মালাকার — কার্যকরী সদস্য, প্রবীর আগরওয়াল — কার্যকরী সদস্য।

উল্লেখ্য, গত ১১ আগস্ট স্বস্তিকা-তে এই মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা ভ্রান্ত ছিল বলে লঘু উদ্যোগ ভারতী-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সুতাহাটায় অখন্ড ভারত দিবস

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে সুতাহাটা থানার কাশীপুর গ্রামে গান্ধী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে কাশীপুর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় 'অখন্ড ভারত দিবস' উদ্‌যাপিত হল। সভাপতিত্ব করেন মুরারি মোহন মান্না।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট যে স্বাধীনতা ভারত পেয়েছে তা স্বচ্ছ নয়। তার আগে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে। এই শর্ত মেনে নিয়ে তবে ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা। হিন্দু মহাসভা খন্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাই হিন্দুমহাসভা এই দিনটিকে 'অখন্ড ভারত দিবস' হিসাবে প্রতিপালন করে আসছে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাধাকান্ত ঘোড়াই, জনার্দন দুবে, অনন্ত সিংহরায় প্রমুখ।

শেওড়াফুলিতে রক্ষাবন্ধন

গত ১৬ আগষ্ট হুগলী জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে শেওড়াফুলিতে রক্ষাবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারামজী কেদিলাই এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১২৫ জন স্বয়ংসেবক ও মায়েরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। সীতারামজী গ্রামের দিকে নজর ফেরানোর কথা বলেন। গ্রাম রক্ষা ও গোরক্ষা হলেই ভারতবর্ষ বাঁচবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানের শেষে সঙেঘর স্বয়ংসেবকরা সকলকে রাখী পরিয়ে দেন।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা নগরের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক বদ্রীনারায়ণ ভদ্র গত ১৩ আগষ্ট পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিন কন্যা ও এক পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

শিলিগুড়িতে সংস্কার ভারতীর রক্ষাবন্ধন উৎসবের মঞ্চে সুনীলপদ গোস্বামী (ডান দিক থেকে) শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, অজিতজী ও বিকাশ ভট্টাচার্য।

সমাবেশ সমাচার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর হাওড়া মহানগরের শিবপুর (হাওড়া) কেশব প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোবর্দ্ধন গাঙ্গুলী গত ২৮ আগষ্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর এক পুত্র ও স্ত্রী বর্তমান। দীর্ঘ দিনের স্বয়ংসেবক গোবর্দ্ধন বাবু তাঁর ব্যবসায়িক সততার জন্য জনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন।

মাত্র ১ টাকায় গোশালার জন্য জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাজ্যে গোশালার প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করল মধ্যপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে গোশালা খোলার জন্য জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি সরকারের ঘোষণা মতো ১ টাকার বিনিময়ে রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত থেকে এই জন্য জমি কিনতে পারবে। ইতিমধ্যেই সরকারিভাবে এই নির্দেশ সমস্ত পঞ্চায়েতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে একটি পঞ্চায়েতের আওতায় মাত্র ১টি গোশালার জন্যই জমি পাওয়া যাবে। যে সমস্ত এন জিও মধ্যপ্রদেশ গো-পালন এবং পশুধন সংবর্ধন বোর্ডের সদস্য তারাই কেবল মাত্র এই জমি কিনতে পারবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই বোর্ডের পদাধিকার বলে সভাপতি ও সহ সভাপতি হলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী।

রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহলের মতে বিজেপি বরাবরই গো-রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই উদ্যোগ অবশ্যই যেকোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম। গোশালা বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সবদিক থেকেই উপকৃত হবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

(১০ পাতার পর)

বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বছর নতুন শুরু হওয়া পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্যাম পিত্রোদার নেতৃত্বে গঠিত 'জ্ঞান আয়োগ'-এ আগামী দিনে উচ্চ শিক্ষায় ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তিকরণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে তা পূরণ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কোথা থেকে আসবে সেকথা এড়িয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ ফলস্বরূপ আরো বেশি বেসরকারিকরণ। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের খরচও বাড়ছে। তাই বিশ্বায়ণের যুগে আগামী দিনে ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় যারা উচ্চ শিক্ষিত হতে চাইবে তারা অর্থের অভাবে সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে কি?

আজকে অর্থনৈতিক মাপদন্ডে আমাদের দেশ 'ভারত' এবং 'ইন্ডিয়া' এই দুই সমান্তরাল ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে ভারতের গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামোহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা আজও গাছের নীচে বসে পাঠ সম্পন্ন করে।

অন্যদিকে ইন্ডিয়ায় আই. আই. টি-র ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার জন্য তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে যায়। এই বৈষম্য আর কতদিন? স্বাধীনতার যাট বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের স্বপ্ন এই ভারত এবং ইন্ডিয়ার সমন্বয়। আর যে দিন এই সমন্বয়ে সম্ভব হবে সেই দিন ভারতবর্ষ 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।'

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

বাংলাদেশ দূতাবাস চলো

জমায়েত — কলেজ স্কোয়ার, দুপুর ১২টা
১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, বুধবার

সফল করুন

শ্রীগুরুজী সমগ্র-এর খবর

শ্রীগুরুজী সমগ্র-এর মাননীয় গ্রাহকবৃন্দ, আপনারা ইতিমধ্যেই দুই কিস্তিতে সাত খণ্ড বই পেয়ে গেছেন। বাকী ৫ খন্ডের মধ্যে দুই খন্ড কেশব ভবনে জমা আছে। ১ খন্ড ছাপার কাজ শেষ। আর ২ খন্ড ছাপার অপেক্ষায়। আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ৫ খণ্ড একসাথে পেয়ে যাবেন। দ্রুত কাজ চলছে। কয়েকটি খন্ডের অনুবাদের দুর্বলতার জন্যেই দেরী হয়ে গেল। পুজো এসে গেল, মায়ের স্নেহ-ছায়ায় সবাই ভাল থাকুন!

— অনুমত্যানুসারে —
নারায়ণচন্দ্র পাল
যোগাযোগ - ২৩৫০-০৫৭৩ (০৩৩)

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চারিদিকে আজ শিল্পের জয়গান
অথচ শিল্পটা যে কী বস্তু,
খায় না মাথায় মাখে
বোঝে না বন্ধ কারখানার শ্রমিকের রুগ্ন স্ত্রী।
এসব নিয়েই

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চলের হাল হকিকৎ

খেলার জগৎ

বেজিং অলিম্পিয়াড

জলে সম্রাট ফেল্পস, মাটিতে বোল্ট

।। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

এক বিশ্ব, এক স্বপ্ন বা বিশ্বজনীন ঐক্য ও মানবতার অঙ্গীকার নিয়ে শেষ হয়েছে ২৯ তম অলিম্পিয়াড। সাত বছরের প্রস্তুতিতে চীন আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে নিজেদের জাত্যাভিমান যেমন তুলে ধরতে পেরেছে, তেমনি গোটা সভ্যতার অবগাহন হয়েছে ৫০০০ বছরের পুরনো এই দেশের জাতীয় জীবনের আবেগে অনুভূতিতে। ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলিম্পিয়াড আয়োজন করে চীনের সঙ্গে বিশ্বমানবত্মার অন্তর্লীন যোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই বোধহয় এই অলিম্পিক থেকে বিশ্বমানস পেল এমন সব অতিমানবীয় কীর্তি যার তুলনা ভাষায় করা সম্ভব নয়।

নিঃসন্দেহে বেজিং অলিম্পিকের দুই মহানায়ক মাইকেল ফেল্পস ও আসাইন বোল্ট। জলে ও স্থলে এই দুই ‘গ্রেট চ্যাম্পিয়ান’-এর পারফরমেন্স ঢেকে দিয়েছে অন্যান্য ইভেন্টে বহু ক্রীড়াবিদের একাধিক সোনা জয়ের গৌরব ব্যাঞ্জনাকে। এদের সঙ্গে অবশ্য তুলনায় আসতে পারেন দুই নারী ইলিনা ইলিনবায়েভা ও স্টেফানি রাইস। ইলিনা বেজিংয়ে নিজের ২৫ তম বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে পোলভল্টে অনায়াস স্বাচ্ছন্দে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেকটাই পিছনে রেখে দ্বিতীয় অলিম্পিক সোনাটি কেড়ে নিলেন। আর জলের রাণী স্টেফানি তিন-তিনটি সোনা পেয়ে স্বদেশীয় (অস্ট্রেলিয়া) দুই প্রাক্তন জলপরী ডন ফ্রেজার ও স্যেন গোল্ডের কথা মনে পড়িয়েছেন।

তবে কোনও কিছুর সঙ্গেই ফেল্পস বা বোল্টের তুলনা করা অবাস্তব। মার্কিনী ফেল্পস এই অলিম্পিকে আটটি সোনা জিতেছেন। এ ব্যাপার কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব? এথেন্স ও বেজিং মিলিয়ে ১৪টি সোনা সহ ১৬টি পদক সোনার নিরিখে পিছনে ফেলে দিয়েছেন পূর্ববর্তী সব সুপার অলিম্পিয়ানদের। আর তিনটি পদক পেলেই ছাপিয়ে যাবেন ষাটের দশকের সেই নান্দনিক সুন্দরী জিমন্যাস্ট ল্যারিসা ল্যাটনিনাকে। কীভাবে বর্ণনা করা সম্ভব ফেল্পসের এই কীর্তিকে। কতটা পরিশ্রম করেন, কি পরিমাণ সুষম খাদ্য খান এসব তথ্যই জানা হয়ে গেছে পাঠকজনের খবরের কাগজের দৌলতে। একটা কথাই শুধু বলতে হয় অলিম্পিকই গৌরবান্বিত হয়েছে এই ধরনের মানুষকে পৃথিবীতে ধারণ করে। দক্ষতা ও ক্ষমতার যে মানদণ্ড তৈরি করেছেন ফেল্পস তার জন্যই যে সভ্যতার টিকে থাকা।

একই কথা প্রযোজ্য জামাইকার আসাইন বোল্ট সম্পর্কে। ট্রাকে স্প্রিন্ট ইভেন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া ও ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে জামাইকার বিস্ময়কর উত্থান প্রত্যক্ষ করলেন বিশ্ববাসী। এই উত্থানের নেপথ্য চালিকাশক্তি কে, এককথায় উত্তর আসাইন বোল্ট। এই পত্রিকাতেই এই প্রতিবেদক অলিম্পিকের ঠিক আগেই বোল্টের গড়া বিশ্ব রেকর্ডের পর তাঁকে সম্ভাব্য সোনা জয়ী হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। লেখা হয়েছিল বোল্ট, স্বদেশের আসা পাওয়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের টাইসনের মধ্যে হবে শতাব্দীর সেরা গতিযুদ্ধ। দুর্ভাগ্য যে ফাইনালে উঠতে পারেননি। কিন্তু আসাইনের মধ্যেই ছিল সেই অদম্য স্পিরিট ও জীবনের চেয়েও বড় কিছু করে দেখাবার তাগিদ। তাই ১০০ মিটার দৌড়ে ৯.৬৯ সেকেন্ডে বিশ্বরেকর্ড করে বোল্ট সোনা জিতলেও প্রত্যেকেই কিন্তু গতির ঝড় তুলে দুনিয়ার দৌড়প্রেমী মানুষের মনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

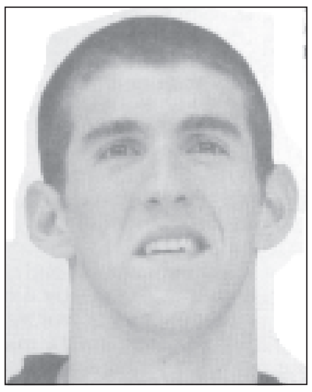
ফেল্পস

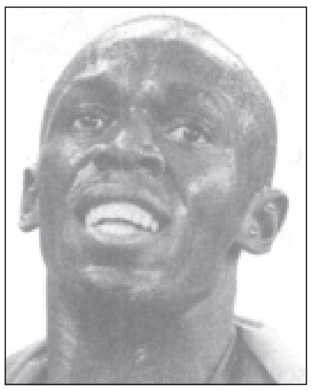
বোল্ট

১০০ মিটারের পর ২০০ মিটারেও বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জিততে বেগ পেতে হয়নি বোল্টকে। তারপর জামাইকার হাতে তুলে দিয়েছেন ৪` ৫ মিটার রিলের সোনা, বাকি তিনজনের সহযোগিতায়। ট্রাকের রাজার মতোই রাজকীয় তাঁর চালচলন, কথাবার্তা। সব সময় যেন প্রমাণ করার চেষ্টা আমাকে দেখুন। সোনা জেতার পর জামাইকার পতাকা নিয়ে যে ভিকট্রিল্যাপ দিয়েছেন সেখানেও নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে মানুষের মনকে আন্দোলিত করে ছেড়েছেন। কথাবার্তাতে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব চুইয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে আসাইন বোল্ট এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যাকেজ, যার পরতে পরতে রয়েছে উত্তেজনা, উন্মাদনা আবেগ ও রোমাঞ্চের পরশ।

এই ধরনের অ্যাথলিটরাই অলিম্পিকের ভূষণ। যেমন ফেল্পস, কম কথা বললেও শরীরী বিভঙ্গে রয়েছে এক অদ্ভুত শোম্যাননিশপ। অলিম্পিকের দিগন্ত বলয়ে যে আলোকের বর্ণমালা তৈরি করেছেন এই দুই কিংবদন্তী, তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রক্ষাই ভাবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ।

শব্দরূপ - ৪৮০

মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস

১	☹	☹	২		৩		☹
	☹	☹		☹		☹	☹
৪	৫			☹	৬	৭	
☹		☹	☹	☹	☹		☹
☹		☹	☹	☹	☹		☹
৮		৯	☹	১০			১১
☹	☹		☹		☹	☹	
☹	১২				☹	☹	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. সাবিত্রীর স্বামী, ৪. আরবি শব্দে ফন্দি, শেষ দুয়ে রামতনয়, ৬. বৎসর, সন, ৮. বড় মাথার এক মাছ বিশেষ, আগাগোড়া বধির, ১০. ত্রি(য়াবিশেষণে আলংকারিক অর্থে অতিদ্রুত, সাত তাড়াতাড়ি, ১২. ব্যাঙের ডাক।

উপর-নীচ ঃ ১. বর্শা, ২. প্রতিশব্দে মুখর, বাকময়, শেষ দুয়ে শব্দ, ৩. ইঙ্গ শব্দে পেঁয়াজ ইত্যাদির মাটির নীচেকার গোল অংশ, শেষ দুয়ে রামপুত্র, ৫. আরবি শব্দে শারীরিক অবস্থা, ৭. মন-ভোলানো হাবভাব বা কৌশল, শঠতা, ৯. প্রতিশব্দে সাবালক, একে তিনে ইঙ্গ ভাগ্য, ১০. দেহের নানা জায়গায় চন্দনের ফোঁটা, ১১. সাহেব-এর ভাষায় সুন্দর।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৮

■	■	■	হা	■	বি	দে	হা
■	কা	না	ত	■	ম	■	ড়
অ	■	■	ছা	গ	ল	■	জি
ছি	ট	কি	নি	■	■	■	র
য়	■	■	■	হি	জি	বি	জি
ত	■	হ	জ	ম	■	■	রে
না	■	তা	■	ক	ড়া	ই	■
মা	ল	শা	■	র	■	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া, চারাবাগান।
বীরেন মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

চীনে ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। একশো বছরের ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হচ্ছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের বেজিং অলিম্পিক অভিযানের প্রেক্ষিতে। সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একক উদ্যোগে নর্মাণ প্রিচার্ডের প্যারিস অলিম্পিয়াড থেকে দুটি রুপোর পদক জয়ের পর স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৫২ তে হেলসিঙ্কী গেমসে হকির সোনা ও কুস্তিতে কে ডি যাদবের ব্রোঞ্জ প্রাপ্তিই ছিল অলিম্পিকে ভারতের সেরা পারফরমেন্স। এবার বেজিং একধাপ এগিয়ে দিল ভারতকে। একটি সোনা সহ তিনটি পদক জিতে ভারত খানিকটা হলেও বিশ্ব অলিম্পিক সংসারে একটা আলোচনার বৃত্ত রচনা করতে পেরেছে।

অভিনব বিন্দ্রা

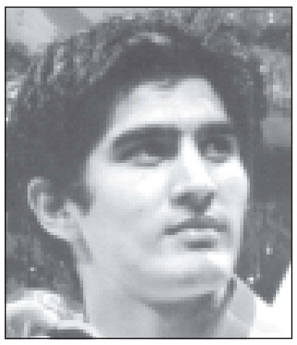
বীজেন্দ্র কুমার

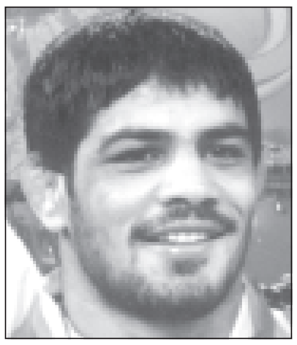
সুশীল কুমার

যদিও প্রতিবেশী চীনের সাফল্য ও গৌরবের পাশে ভারতের সাফল্যের অস্থিত্বই চোখে পড়বে না। চীন সর্বকালীন রেকর্ড করে ৫১টি সোনা তুলে নিয়েছে। এই রেকর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাবেক সোভিয়েতে রাশিয়ার কারুরই নেই। সব মিলিয়ে চীন ১০০টি পদক তুলেছে। পদকের নিরিখে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে। ৩৬ টি সোনা সহ তাদের সংগৃহীত ১১০টি পদক। বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখিয়েছে গ্রেট বৃটেনও। সম্ভবত পরের অলিম্পিয়াড তাদের দেশে বলেই। রাশিয়াকে টপকে তারা তৃতীয় স্থানে চলে এসেছে। প্রথম দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে এশিয়ার তিন দেশ চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। ভারতের স্থান হয়েছে ৫০ তম, ২০৫ টি দেশের মধ্যে। তবে ভারতের আগে রয়েছে আরও বেশ কিছু এশিয় দেশ। তাই বলতে হয় বিশ্ব ক্রীড়ায় এশিয়া ক্রমেই দৈত্যশক্তির মহাদেশ হয়ে উঠতে চলেছে। পাশ্চাত্যের উন্নাসিক সমাজ এই ব্যাপার দেখে মোটেই খুশি নয়। চীন, জাপান, কোরিয়ার দিকে তাকিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রীড়ানীতি ও ক্রীড়াসংস্কৃতি আন্দোলনের রূপরেখা এখনই প্রণয়ন করতে হবে — ভবিষ্যতে যদি ভারতকে প্রথম কুড়িটি দেশের মধ্যে থাকতে হয়। অভিনব বিন্দ্রা, সুশীল কুমার, বীজেন্দার কুমারের পদক প্রাপ্তি মনে হয় ঘুমন্ত এই দেশকে জাগাতে পারবে। দেশের মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেল ক্রিকেট নয়, একমাত্র অলিম্পিক গৌরব ও স্বীকৃতিই একটা জাতির বেঁচে থাকার, মাথা উঁচু করে চলার জীবনদায়ী প্রেরণা।

তিন ক্রীড়াবিদের সাফল্যই এসেছে ব্যক্তিগত কৃতসংকল্প, নিজস্ব কোচ ও ট্রেনারের কার্যকর ভূমিকা ও বিদেশে নিয়মিত অনুশীলন ও টুর্ণামেন্ট খেলার দৌলতে। প্রথম দুটির জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সিস্টেমের কোনও ভূমিকা নেই। শেষ ব্যাপারটির জন্য ধন্যবাদ ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা ও সরকারের ক্রীড়াদপ্তরকে। ইদানিং প্রায় সব খেলাতেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা মোটামুটি বিদেশে ‘এক্সপোজার টুর্ণামেন্ট’ পাচ্ছেন। বিদেশ থেকে কোচও আনা হচ্ছে অনেক খেলায়। এর মধ্যে সুফল ফলতে শুরু করেছে শুটিং, বক্সিং ও তীরন্দাজী জিতে। শুটিংয়ে অভিনব ছাড়া এবার অবশ্য তেমন কেউ সফল নন।গত অলিম্পিকে রাজ্যবর্দ্ধন রুপো পেয়েছিলেন। ফাইনালে উঠেছিলেন অভিনব, যশপাল রানা। তীরন্দাজির মহিলা দল শেষ চারে যান।

এবার শুটিং তীরন্দাজির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। ভারতের তিন-চারজন শুটার বিশ্বমানের তীরন্দাজিতে দোলা ব্যানার্জি গত বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। এরা কেউ সেমিফাইনালে উঠতে পারেননি। সেদিক থেকে ব্যর্থই বলতে হবে শুটিং ও তীরন্দাজির সার্বিক প্রেক্ষাপটে। এই ব্যর্থতা পুষিয়ে দিয়েছেন বক্সাররা। কিউবান কোচের অধীনে বছরের পর বছর প্রশিক্ষণ নিয়ে ও বিদেশে লড়াইয়ে অংশ নিয়ে এরা যথেষ্ট পরিশীলিত ও খেতাব জয়ের জন্য ব্যগ্র। তার প্রমাণ অখিল, জিতেন্দর, বীজেন্দর তিন হরিনাভি কুমারের বাহাদুর প্রদর্শন। প্রথম দুজন কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। বীজেন্দর সেমিফাইনালে গিয়ে ব্রোঞ্জ পদক সুনিশ্চিত করেন। কুস্তিতেও সুশীল কুমার শেষ চারে গিয়ে ব্রোঞ্জের লড়াইতে টেক্কা দেন কাজাখস্তানের মল্লবীরকে। এদের সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে হকির জন্য হাপিত্যেস করে বসে না থেকে ব্যক্তিগত স্তরের খেলাগুলিকে গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করলে ভারত অলিম্পিকে আর দুয়োরাণী থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাগল চরছে উপাচার্য সংবর্ধনা কুড়োচ্ছেন

শিবাজী গুপ্ত

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত জমি অর্থাৎ ধূ-ধূ প্রান্তরে একটা ছাগল তৃণ ভক্ষণ করছে। আর খবরে প্রকাশ নবনিযুক্ত উপাচার্য তাঁর সৌভাগ্যের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সম্বর্ধনা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। ছাগল ও উপাচার্য উভয়ই ভাগ্যবান!

দেখা যাচ্ছে এই দুর্ভাগা রাজ্যে একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার চেয়েও একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কতো সহজ! একটা সেমিনার হল। তাতে একই গোত্র-গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা আমন্ত্রিত হল। প্রচুর খানাপিনা ও শিক্ষা সংস্কৃতির সাফল্য নিয়ে বকবকানি হল। তারপর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হল এবং তিলেকমাত্র দেরি না করে আগামী শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ২০০৮-০৯ থেকেই বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ, এম এস সি, এম কম পড়া শুরু হয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হল। যাতে আগামী নির্বাচনের আগেই বারাসতী এম এ, এম এস সি, এম কম-রা উত্তর ২৪ পরগণার রাস্তাঘাটে কিলবিল করে ও ভোটবাক্স পূর্ণ করে।

যথারীতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাবার অজুহাত তুলেই বারাসত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ইতোপূর্বেও কলকাতার ভার কমিয়ে ধার বাড়াবার অজুহাতে চারটি আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাছাড়া কলকাতার উপর দুটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্র ভারতী ও যাদবপুর) রয়েছে। নদীয়া জেলায় দুটি (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) বিরাজ করছে। বীরভূমে স্বনামে ও বেনামে অধিষ্ঠিত রয়েছে বিশ্বভারতী। তারপরেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদহে একটি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা সম্প্রসারণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত থেকেই এসব তেলাপিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্রমাগত বংশবৃদ্ধির ফলে শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগির দরুণ ষোল আনা জমিদারির জায়গায় যেমন অনেক সাড়ে সাত গণ্ডার (অর্থাৎ দেড় পয়সার) জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সেই দশা ঘটেছে। ক্রমাগত কাটতে কাটতে, ছাঁটতে ছাঁটতে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের তো নুলো জগন্নাথের দশা ঘটেছে। তার নিম্নাঙ্গ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমেডিয়েট ছাঁটা হয়েছে সর্বপ্রথম। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার শিরোচ্ছেদ করা হয়। কল্যাণী যদি তার বামাঙ্গ খেয়ে থাকে, মেদিনীপুর তার দক্ষিণাঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছে। আর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যাঙ্গের অনেকখানি উদরস্থ করেছে। এখন যেটুকু নিয়ে তার বুক ধুকপুক করছে, বারাসত বিশ্ববিদ্যালয় তাতেও খাবলা বসাতে যাচ্ছে। এক কথায় আজানুলম্বিত আচকান ছাঁটতে ছাঁটতে ফতুয়ায় পর্যবসিত হয়েছে।

কথায় বলে, ছিল ঢেঁকি হল তুল ঃ ছাঁটতে ছাঁটতে সব নির্মূল— অর্থাৎ ঢেঁকিকে ক্রমাগত ছাঁটতে ছাঁটতে তুলাদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সে দশা। কিন্তু যে আশায় এতো কাটছাঁট, কিছুতেই সে আশা পূর্ণ হচ্ছে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার তো কমছেই না, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ঠিক যেমন দুম্বার পাছার গোস্ত কেটে নিলে কয়েক দিনের মধ্যে নতুন গোস্ত গজিয়ে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। দুর্ভাগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর জমিদারি যখন লাটে উঠছে, তখন তাঁকেই সে সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় নাকি আন্তর্জাতিক মানের হবে। তাহলে এযাবৎ স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে আন্তর্জাতিক মানের হয়নি, রাজ্য বা জেলা স্তরের ঊর্ধে উঠতে পারেনি, সেকথা মেনে নেওয়া হল। এটিরও যে একই গতি হবে না তার নিশ্চয়তা কি?

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নাকি এমনই হবে যে, পাশ করলেই চাকরি হবে। তাহলে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীও অনুরূপ ভাবে পরিবর্তন করা হোক না। কেন সেগুলিতে বেকার সৃষ্টিকারী পাঠ্যসূচী অনুসৃত হচ্ছে?

'আঞ্চলিক বিষয়' এবং 'ফিল্ড ওয়ার্ক' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান পাবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এসব বিষয়ে এই বারাসত জেলা অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। সকালে সংবাদপত্র খুললেই তা চোখে পড়ে। আমরা সে অনুসারে কতগুলি বিশেষ বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্তির প্রস্তাব রাখছি—

(ক) পাচারোলজি বা পাচারবিজ্ঞান (গরু ও মেয়ে পাচার)।

(খ) জালোলজি বা জালবিজ্ঞান (নোট, পাশপোর্ট, সার্টিফিকেট জালবিদ্যা)।

(গ) অনুপ্রবেশ তত্ত্ব বা ইনফিলট্রেশনোলজি।

(ঘ) ধর্ষণ বিজ্ঞান বা রেপোলজি।

(ঙ) অপহরণ বিজ্ঞান বা অ্যাব্ডাক্সনোলজি।

(চ) স্মাগলিং টেকনোলজি— চোরাইচালান তত্ত্ব।

(ছ) বাজ-বাজি দর্শন— তোলাবাজি, প্রমোটারি, বোমাবাজি ফিলোসফি।

(জ) সন্ত্রাস বিজ্ঞান ও তৎসহ সেবোটোলজি, ইত্যাদি।

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর যখন একত্র সমাবেশ ঘটেছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজ যে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাবা আলিমুদ্দিনেশ্বর যখন সহায় আছে, তখন কোনও বাধা প্রতিবন্ধকতাই ঘটবে না, সেকথা নিশ্চিত। বড় মুখ করে বলা হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নাকি 'স্বশাসন' নিয়ে কাজ করতে দেওয়া হবে। বাকি আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তো 'স্বশাসন' নিয়ে কাজ করছে। সেখানে স্বশাসনের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে, তাতে বারাসতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কি ধরনের স্বশাসন হবে তা বুঝতে পারছি না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬২ জন সিনেট সদস্যের মধ্যে আলিমুদ্দিনের প্রসাদপুষ্ট ছাড়া একজনও বাইরের লোক আছে কি? বিশ্বভারতী ছাড়া বাকি আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক ও আধিকারিক পদে একজনও অ-সিপিএম প্রার্থী নিযুক্ত হয়েছেন কি?

তবে বড় বড় কথার ফুলঝুরির মাঝে একটি গোপন ও সত্য কথা বেরিয়ে পড়েছে। বলা হয়েছে, জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সামিল করা হবে। অর্থাৎ ৬০ বছর বয়সে অবসর প্রাপ্ত যেসব কলেজ অধ্যাপক বেকার বসে আছেন, তাঁরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়াবেন। অর্থাৎ যারা লাল-খাতায় একবার নাম লিখিয়েছেন, অবসরের পরেও তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে জাবনার ব্যবস্থা করা হবে। খাটিয়ায় ওঠার আগে ছাড় নেই।

আর এদিকে ভাইস-চ্যান্সেলর-এর জন্য আলিমুদ্দিনের সামনে লাইন তো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় না খুলে উপায় কী? আর এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় মানে তো কমপক্ষে এক হাজার কমরেডের চাকরি। পুষ্যি পোষণের একমাত্র বিচরণক্ষেত্র তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নেই!

খবরে আরও প্রকাশ, বারাসত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ২৪ পরগণার কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা একদিনের মাহিনা দান করেছেন। এই ঘোষণা টেবিল চাপড়িয়ে অভিনন্দিত হয়েছে। ভালো কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা যদি সাত দিনের মাহিনা দান করেন, তহলে বারুইপুর বা ডায়মণ্ডহারবারে 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিশ্ববিদ্যালয়' হবে কি? দক্ষিণ ২৪ পরগণার সে সৌভাগ্য কবে হবে?

শিক্ষক নেতা অনিল ভট্টাচার্য মশাই কি বলেন?

স্বস্তিকা
পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ
এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস

তনয়া
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত
এই আখ্যানের নায়িকা রিয়া। যাকে বিলাসপুর থেকে নিছক চাকরির খোঁজে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কিন্তু প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। তাই আজ রিয়া চলে যাবে, কিন্তু এবার শান্তির সন্ধানে। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিল রিয়ার জীবনে?

মুক্তিপণ
শেখর বসু
'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি সত্যি অপহরণ করা হয়েছে? হতে পারে। নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে? গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

এই সময়
কণাবসু মিশ্র
'নিজেকে খুব উঁচু মাপের মানুষ করে রেখেছে সৈকত। আর সীমান্তিনী ক্রমেই ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবুও সৈকতের জন্যই ছুটছে সে। কান্নার পুরু সর জমতে জমতে ওর বুকের মধ্যে যেন গ্র্যানাইট পাথর হয়ে গেছে।'— এর সমাধান কোথায়? স্বামী মুক্তানন্দজীর মার্গদর্শন কী সীমান্তিনীকে পথ দেখাতে পারবে? দুই সন্তানের জননী যাজ্ঞসেনীরই বা কী হবে?

গল্প

জলের দামে এক টুকরো জমি বিক্রি হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুরের নামোপাড়ায়। কিন্তু জমিটা কিনেই মুশকিলে পড়ে গেল রাখাল। ক্লাব বলছে জমিটা নাকি ক্লাবের। জমিটা পেতে গেলে কীভাবে পাওয়া যাবে?
রফা
সজল দাশগুপ্ত

কেন্দ্রীয় চরিত্র সুমিত্রার কী চৌধুরী বাড়ির মতো শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে শঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়াটা ঠিক হল? কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে! অকাল বৈধব্য সুমিত্রার কোন্ এক ভাইপোর সঙ্গে বেরিয়ে আসাটা— শেষ পর্যন্ত কি পরিণাম ঘটাবে?
নিষ্ক্রমণ
মানবেন্দ্র পাল

লিখেছেন :— রমানাথ রায়, গোপাল কৃষ্ণ রায়, দীপঙ্কর দাশ, সুমিত্রা ঘোষ, এষা দে, চণ্ডী লাহিড়ী, কে এস সুদর্শন, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুবীর ভৌমিক, প্রীতিমাধব রায়, গুরুপদ শাণ্ডিল্য, নৃপেন আচার্য, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ।

এছাড়াও থাকছে আরও অনেক ছোট গল্প, রম্যরচনা এবং নানা ভাবনায় সমৃদ্ধ বিভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধগুচ্ছ।

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে ◆ দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

Swastika
8September - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

আমেরিকা ও বৃটেনে সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিশ্বের সর্ববহৎ সামাজিক সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও নানা নামে সঙ্ঘের কাজ চলছে, বিশেষত বৃটেন ও আমেরিকায়। যেমন বৃটেনে 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে স্বয়ংসেবকরা কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘ সেখানে শাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজকর্মও করেছে। প্রায় ৪০টি দেশে সঙ্ঘের কাজ আছে। সঙ্ঘের এই পরিচিতি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদেরই হাত ধরে। শ্রীগুরুজীর কথায় ''হিন্দু জনগণকে তাঁদের অনুপম জাতীয় প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনগঠিত করার যে আদর্শ সঙ্ঘ গ্রহণ করেছে তা ভারতের প্রকৃত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মহান প্রয়াসই শুধু নয়, বিশ্ব একতা ও মানবিক কল্যাণের স্বপ্নকে উপলব্ধি করার অপরিহার্য পূর্বশর্তও বটে।' বিদেশে বিশেষত, আমেরিকা ও বৃটেনে সঙ্ঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা এখানে তুলে ধরা হল।

বার্মিংহামে স্বয়ংসেবকদের গীত প্রতিযোগিতা।

আমেরিকায় প্রথম ঘোষবর্গ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে পঞ্চবটী আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে সঙ্ঘের ঘোষ বিভাগের প্রশিক্ষণ শিবির অর্থাৎ ব্যাণ্ড বিউগল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের রচনাগুলি (সুর-তাল-লয়) শিক্ষাক্রম শুরু হল। আর এর ফলে আশ্রমের পরিবেশ যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সকলেই নিজের নিজের ঘোষ পাঠ্য ঝালিয়ে নেওয়ার কাজে ছিল ব্যস্ত। লক্ষ্য — জানা ঘোষ রচনাগুলোকে আরও ঘষে মেজে উন্নত করা। এজন্য শিক্ষক স্বয়ংসেবকরাও ছিলেন যত্নবান। হাতে-কলমে ঘোষের বিভিন্ন রচনা শেখানোর পাশাপাশি ঘোষের ইতিহাসকেও আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। একসাথে বাজনার রোলের অনুরণনে যে ঐক্যতান সৃষ্টি হল, তা আনন্দে সকলের মন ভরিয়ে দেয়। মধ্যবয়সী থেকে প্রৌঢ় সব বয়সেরই স্বয়ংসেবকেরা ছিলেন। ৫৪ জন স্বয়ংসেবক ও স্বয়ংসেবিকার শিক্ষা সার্থক হল (২৭ এপ্রিল) পথ সঞ্চলনের মধ্য দিয়ে। বাজনার তালে তালে পা মিলিয়ে চলবার সঙ্গে যে অনুশাসন ও একাত্মতার সৃষ্টি হল তা শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের প্রেরণার পাথেয় হয়ে রইল।

সেবার অনুভব

রাত্রিতে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জগন্নাথ ধাম মন্দিরে কয়েকজন নিজের নিজের কাজে ছিল ব্যস্ত। ঘড়ির দিকে তাদের কারও নজর নেই। লক্ষ্য শুধু একটাই, কী করে কাজটা যত্ন সহকারে করা যায়! কিন্তু কাজটা কী? দাদা, কাজটা ভগবানের —Brother, the work of the god — কথাটা বলছিলেন এক স্থানীয় বাসিন্দা।

তারা সকলেই ব্যস্ত ছিলেন মন্দিরের দরজা, জানলা ও চত্বরটিকে সাফ করার কাজে। সাফাই-এর কাজে এরা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় শাখার স্বয়ংসেবক ও স্বয়ংসেবিকা। উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে জগন্নাথ মন্দির পরিষ্কারের মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বের দরবারে সঙ্ঘের একাত্মতার ভাবনাকে তুলে ধরলেন। পরের দিন সকালে ওই মন্দির চত্বরে শাখার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

নিউজিল্যান্ডে সেমিনার

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের ওপর বার বার গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে আজ তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

মানসিক রোগের নিরাময়ে আধ্যাত্মিক বিকাশের ভূমিকা কতটা — এই বিষয়ের ওপরই সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ সেমিনার অনুষ্ঠিত হল নিউজিল্যাণ্ডে। ২০০-রও বেশি পেশাদার মনোরোগ স্বাস্থ্যকর্মী এতে অংশ নেয়। সেমিনারে মনোরোগীদের ওপর ভক্তিচেতনার প্রভাব কতটা, তথা তাদের নিরাময়ে বা স্বস্তিতে ধর্মীয় বিকাশের ভূমিকার ওপরেও বক্তারা আলোকপাত করেন।

নিউজিল্যান্ডে হিন্দু সম্মেলন

নিউজিল্যান্ডের ঝা চকচকে হেরিটেজ সেন্টারের রূপটা যেন গত মে মাসের তিনদিন একটু অন্যরকম ছিল। বিশ্ব একতার অখণ্ড চিত্রটা যেন হেরিটেজ সেন্টার আবারও একবার নিউজিল্যাণ্ড শাখার দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর প্রাচীন যোগের ওপর অভূতপূর্ব প্রদর্শনীতে যেন দর্শকদেরও মন ভরে গেল। অধ্যাত্মিক মুখর হয়ে উঠল যেন সমগ্র নিউজিল্যাণ্ড। শুধু কি তাই। যোগ ও আয়ুর্বেদের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন দিক নির্দেশ হিন্দু জীবন রচনার এক উজ্জ্বল দিককে তুলে ধরল। ঘোষিত হল হিন্দু সংস্কৃতির এক কল্যাণময় বার্তা।

বৃটেনে প্রৌঢ় শিবির

দু'দিনের প্রৌঢ় শিবিরের দিনগুলি আজও তাঁদের চোখের সামনে ভাসছে। বাড়ি থেকে দুদিন সব চিন্তামুক্ত হয়ে একটা অন্যরকম পরিবেশ। তাদের সকলেরই বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশের ওপর। সকাল থেকেই চলত দেব-দেবীর বিগ্রহের সামনে ওঁকার ধ্বনির সঙ্গে অধ্যাত্মিক সাধনা। শুধু কি তাই, প্রাণায়াম, খেলা, যোগব্যায়াম — শরীর চর্চার খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ। সঙ্গে ছিল বৌদ্ধিক চর্চা। যথারীতি সময় মাফিক চলত একটার পর একটা কালাংশ। সংগচ্ছধম্ সংবদধবম্ নীতিতে একসাথে সবকিছু করার অভিজ্ঞতা। এই শিবিরকে ঘিরে প্রৌঢ় স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ উদ্দীপনা কোনও অংশেই কম ছিল না।

এদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এই রকম প্রৌঢ় শিবির হলেও এই শিবিরটি কিন্তু এদেশের নয় — বৃটেনের প্রৌঢ় স্বয়ংসেবকদের সম্প্রতি দুদিনের এই শিবির শেষ হয়েছে। ১০৮জন স্বয়ংসেবক এতে অংশ নেয়। বিদেশের আয়ুর্বেদের প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ডাঃ জে যোশী সুস্থ জীবন গঠনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন।

বৃটেনে প্রৌঢ় বর্গ চলছে।

বার্মিংহামে গীত প্রতিযোগিতা

ছোট কচিকাঁচারা সারিবদ্ধ ভাবে পরিবেশন করল দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। শুধু যে তারাই অংশ নিল তা নয়, অভিভাবকদেরও সঙ্গীত প্রতিযোগিতাকে ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বাদ্য-বাদকদের মধ্যেও ছিল একটা আলাদা উৎসাহ। বালক ও শিশুদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান শোনার ইচ্ছা নিয়ে দর্শকরাও যথাসময়ে ভিড় জমিয়েছিল বার্মিংহামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত গানের প্রতিযোগিতায়। বাদকদের প্রত্যেকের গলায় গেরুয়া উত্তরীয়। প্রতিযোগীদের কপালে ছিল গেরুয়া কাপড়ের ফেট্টি। অপূর্ব সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতার দৃশ্যটা ছিল সত্যিই চোখ ধাঁধানোর মতো। বার্মিংহামের আনন্দ মিলন কেন্দ্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল গীত প্রতিযোগিতা। ১১টি টিমের এই প্রতিযোগিতায় অভিভাবকেরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তাঁরাও যেন অভিভূত হয়ে পড়েন দেশভক্তিমূলক গানের এই প্রতিযোগিতায়।

বোল্টন-এ সঙ্ঘস্থান দিবস

বোল্টনের উত্তর-পশ্চিম বিভাগের সঙ্ঘস্থান দিবস উৎসব। অনুষ্ঠান মানেই তো আনন্দের। তবে সঙ্ঘস্থান উৎসবের আনন্দটা একটু অন্যরকমই। দিনভর পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য যেন একতার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া। সারাদিন একসাথে হাঁটা, গল্প করা, অপরিচিত পরিবারের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তোলা এমন সুযোগ তো আর বারবার আসবে না।

স্থানীয় ও প্রবাসী স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উৎসবকে ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল তুঙ্গে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমের মূল অংশটা ছিল অংশগ্রহণকারী পরিবারের সবার সঙ্গে সহভোজ, সব মিলিয়ে একাত্মতার উৎসব।

বৃটেনে হিন্দু সংগঠন দিবসে শারীরিক কার্যক্রম।

রাগবি শাখার অর্থ সংগ্রহ

ক্যানসারের মতো মারণ রোগের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে বৃটেনের রাগবি শাখার স্বয়ংসেবকরা অর্থ সংগ্রহ করে তা সেবা ন্যাশনালের হাতে তুলে দেন। তাঁরা ৬০০ পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করেন।

জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ সাজো প্রদর্শনী

উত্তর কলকাতায় কৃষ্ণ সাজো অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য।

সংবাদদাতা ।। বিবেকানন্দ পাঠচক্র, সংস্কার ভারতী, উত্তর কলকাতা শাখার সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবনের প্রাঙ্গণে শুভ জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণরূপ সজ্জার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিকাশ ভট্টাচার্য্য জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করার তাৎপর্য্য বর্ণনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জিতাত্মানন্দ সকলের হাতে প্রশংসা পত্র তুলে দেন। অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট সাংবাদিক ডঃ বিজয় আঢ্য, শ্রী তুষার কান্তি মুজমদার, পূর্ণ চন্দ্র পুইতণ্ডী ও সুভাষ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত থেকে শিশু কৃষ্ণদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর সদস্যরা ভজন গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ভরত কুণ্ডু ও সুদীপ দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ৪০ জন কৃষ্ণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতা

সংস্কার ভারতী-র দক্ষিণ কলকাতা শাখার উদ্যোগে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান পালন করা হয় গত ২৩ শে আগষ্ট সন্ধ্যায় ৪৩, লেক এ্যাভিনিউ স্থিত শাখা সম্পাদিকার গৃহে। শাখার সদস্যরা 'কৃষ্ণ কথা' নামে একটি মনোজ্ঞ আলেখ্য উপস্থিত করেন। এছাড়াও শাখার বিভিন্ন সদস্য উপযুক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মেদিনীপুর

গত২৪ আগষ্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে শুভ জন্মাষ্টমী ও পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ মন্দিরচক থেকে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা শুরু করে। কীর্তন সহ পরিক্রমা দেড়ঘন্টা ব্যাপী শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শেষ হয়। পরিষদের নেতৃবৃন্দ মনোরঞ্জন কবি, উজ্জ্বল মজুমদার, প্রদ্যোত সাউ, সুহাস রঞ্জন পাত্র, নিরূপমা সাহু, উত্তম চক্রবর্তী, অশোক ভক্ত ও অন্যান্যরা এই পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করে

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com